ফুল
খেলবার
দিন নয়

শাহীন
১৩/৩/৮২ইং
ঢাকা।

ফুল খেলবার দিন নয়

একুশের প্রকাশনা '৮২

G. Mostafa Shaheen
114, North Hostel
Dacca College Dacca.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)

সম্পাদক : আলী রীয়াজ

প্রচ্ছদ : সাজ্জাদ হোসেন ।। ডাকসু কার্যালয়, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
মুদ্রনে : এসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স লিমিটেড, ৩/১, জনসন রোড, ঢাকা।

সূচীপত্র

একুশে ফেব্রুয়ারী কি ব্যর্থ হয়ে গেছে ?

সাক্ষাৎকার নিবন্ধ ঃ

সরদার ফজলুল করিম ৩
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৫
কবীর চৌধুরী ৭
আবু হেনা মোস্তফা কামাল ৯
ক,আ,ই,ম, নুরউদ্দিন ১১
আবুল কাসেম ফজলুল হক ১২
মাহমুদুর রহমান মান্না ১৬
মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ ১৮
সুব্রত শংকর ১৯
কবীর আশরাফ ২১
সলিমউল্লাহ খান ২২
সৈয়দ আখতার মাহমুদ ২৭
মনিরুল ইসলাম খান ২৯
আফতাব আহমদ ৩১
এ,কে,এম, হারুনার রশীদ ৩২

প্রবন্ধ ঃ

উন্নয়নের ধারণায় বিভ্রান্তি
আলী রীয়াজ ৩৩

কবিতা ঃ

হাসান হাফিজ ৫১
কামাল চৌধুরী ৫২
মোহন রায়হান ৫৩
শাহজাদী আঞ্জুমান আরা ৫৪
রেজা সেলিম ৫৫
হোসেন সোহরাব ৫৬
ফারুক হাসান ৫৭

গল্প ঃ

অবরোহণ/ফারুক মঈনউদ্দিন ৫৮
অন্ধ/ইসহাক খান ৬৪

একুশে ফেব্রুয়ারী- - -

একুশে ফেব্রুয়ারী বারবার ফিরে আসে,
ফিরে আসে আমাদের
আলোকিত সত্তা ও চেতনার কাছে।
প্রতিবার আমরা শাণিত হই,
শাণিত হই
নতুন অঙ্গীকারে ও প্রত্যয়ে।

একুশে ফেব্রুয়ারী
আমাদের সংগ্রামের পথে জোগায় প্রেরণা,
আলোক-শিখা জ্বেলে দেয়
আমাদের
পথের ওপরে। আমরা পথ দেখি
যে আলোয় তারই নাম
একুশে ফেব্রুয়ারী।

অরক্ষিত জনপদে বিরাশীতে একুশ কি
আবার ক্রোধের অনল
জ্বেলে দেবে?
শোষণ ও বঞ্চনা, বৈষম্য ও স্বৈরাচার
সমস্ত নিপীড়ণের বিরুদ্ধে
আমাদের প্রতিবাদের
ভাষা জোগাক
একুশে ফেব্রুয়ারী।

সমস্ত নৈঃশব্দ ভেঙ্গে, স্তব্ধতার কানে কানে
কথা বলে উঠি;
বলে উঠি: অনাগত দিনের কথা,
নতুন সমাজের কথা।

ফুল খেলবার দিন নয়
জাগবার দিন আজ—

একুশে ফেব্রুয়ারী কি ব্যর্থ হয়ে গেছে? / সাক্ষাৎকার নিবন্ধ

একুশে ফেব্রুয়ারীর একটি বড় শিক্ষা হলো আত্মসমীক্ষা। প্রতি বছরই একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের সুযোগ তৈরী করে দেয় আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণের। হিসেব-নিকেশ করে দেখবার সুযোগ মেলে: আমরা কি এগিয়েছি না কি পিছিয়ে পড়েছি। একটি জাতির অগ্রযাত্রায় এই আত্মসমীক্ষা অত্যাবশ্যকীয়। সেই প্রেক্ষাপটেই এই সাক্ষাৎকার-নিবন্ধের সূচনা। ভাষা আন্দোলনের তিরিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন ছাত্র ও শিক্ষকের কাছে আমরা প্রশ্ন রেখেছিলাম 'একুশে ফেব্রুয়ারী কি ব্যর্থ হয়ে গেছে? যে পটভূমিতে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তা সবারই জানা। তবু আমরা লেখকদের সুবিধার্থে পুরো পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে একটি লিখিত চিঠি প্রেরণ করি।

চিঠিতে বলা হয়েছিলো:
“সুধি,

উনিশ শো বিরাশির একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী মহান একুশের তিরিশ বছর পূর্ণ হবে। স্বাধীনতা-পূর্বকালের দু'টি দশকে একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন আমাদের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উৎসভূমি হিসেবে কাজ করেছে, কাজ করেছে বাঙালী জাতিসত্তার জাগরণ-সঙ্গীত হিসেবে, আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে। পরবর্তী দশ বছরে একুশে ফেব্রুয়ারী ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে এসে সাংবাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার দশ বছর পরে আজ দেশ জুড়ে এক নতুনতর পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে--স্বৈরাচারী শক্তির উত্থান, গণতান্ত্রিক শক্তির গণবিচ্ছিন্নতা, পরাভূত ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরাবির্ভাব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবমূল্যায়ন এবং সঠিক রাজনৈতিক শক্তির দুর্বলতা---এই হচ্ছে আজকের রাজনৈতিক অবস্থার চেহারা। এমনি

একটি পরিস্থিতিতে আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক বলে আমাদের বিশ্বাস। এই নিরিখেই একজন সচেতন ও প্রাগসর, চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ হিসেবে আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন : "একুশে ফেব্রুয়ারী কি ব্যর্থ হয়ে গেছে?"

একুশের তাৎপর্য আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে অবসিত নাকি নতুনতর ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে---আমাদের বিশ্বাস, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের ভেতরেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে। আত্মবিশ্লেষণের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে আপনার সহযোগিতার স্মারক হিসেবে সংক্ষিপ্তাকারে আপনার উত্তর লিখে পাঠালে অত্যন্ত আনন্দিত হবো।

ধন্যবাদসহ—"

এই চিঠির উত্তরে পাঠানো বক্তব্যই নিবন্ধে মুদ্রিত হয়েছে। লিখিত বক্তব্যেরই অংশ বিশেষ ব্যবহৃত হয়েছে শিরোনাম হিসেবে।

এই সমস্ত বক্তব্য থেকে যে কথাটি প্রধান হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে---অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষকই উল্লেখ করেছেন তা হলো একুশে ফেব্রুয়ারীকে এক নতুনতর ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা। আজকের দিনে বিরাজিত সংকট থেকে মুক্তির জন্যে এই কাঠামো যে কোনো ভাবেই সহায়ক নয়—এই সত্য কম-বেশী সবার বক্তব্যেই বিধৃত। একুশে ফেব্রুয়ারীর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণ করতে গিয়ে অধিকাংশ সাক্ষাৎকার-দাতাই এই আপাতঃ ব্যর্থতাকে দেখছেন আমাদের সমাজের কর্তা-শ্রেণীটির শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা হিসেবে। আর তা থেকেই বোঝা যায় যে, আমাদের শোণিত ধারার মতো একুশের চেতনাকে প্রবাহিত রাখতে হলে একুশে ফেব্রুয়ারীকে নিয়ে যেতে হবে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে। আর তার জন্যে দরকার একটি সঠিক ও ইতিবাচক রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ। তার অভাব একুশে ফেব্রুয়ারীকে ক্রমেই সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করে ফেলবে, বারংবার প্রশ্ন উঠতে থাকবে : একুশে ফেব্রুয়ারী কি ব্যর্থ হয়ে গেছে?

শোষনমুক্ত সমাজ তৈরী সকল শ্রেণীর যৌথ লক্ষ্য হতে পারে না / সরদার ফজলুল করিম

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ডাকসুর তরফ থেকে উৎথাপিত প্রশ্নের পূর্বে উল্লেখিত ভূমিকাটি যথার্থ। স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত একুশে ফেব্রুয়ারী গণতান্ত্রিক এবং প্রতিবাদী আন্দোলনের উৎসভূমি হিসাবে কাজ করেছে। পূর্ব বাংলার সর্বশ্রেণীর একক শত্রুর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটি পটভূমি তখন তৈরী হয়েছিল।

১৯৭১ সালের সফল স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের দেশ তথা সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জন ব্যতীত সমাজ বিকাশের পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে অধিকতর কষ্টসাধ্য হত। স্বাধীনতার উত্তরকালের পর্যায় হচ্ছে শোষণমুক্ত সমাজ তৈরীর পর্যায়। এ পর্যায়ে দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণীশক্তি সমূহের পুনর্বিন্যাস ঘটতে বাধ্য। শোষণমুক্ত সমাজ তৈরীর লক্ষ্য সমাজের সকল শ্রেণীর যৌথ লক্ষ্য হতে পারেনা। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে যারা উচ্চতর শ্রেণী, যারা সমাজ রূপান্তরে নিজেদের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে তারা সমাজ রূপান্তরের আন্দোলনে মনে প্রাণে শরীক হতে পারেনা। একুশে ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রতীক। ৭১-উত্তর কালে ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর সংগ্রামের আরাধ্য প্রতীক হিসাবে কাজ করতে পারেনা। এ কারণে বর্তমান পর্যায়ে সমাজের সকল স্তর থেকে একুশের তাৎপর্যের অভিন্ন ব্যাখ্যা আমরা আশা করতে পারিনে। সমাজের সুবিধাভোগী এবং শাসক শ্রেণীসমূহ আজ স্বাভাবিকভাবে একুশকে মৃত বলে গণ্য করবে। তাদের কাছে একুশের আর কোন তাৎপর্য অবশিষ্ট নেই। তাই একুশকে তারা স্মৃতি পালনেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের দিনে শ্রমজীবী শোষিত মানুষ এবং তাদের পক্ষের সংগ্রামী

শক্তির কাছে একুশ মৃত নয়। একুশ নূতনতর তাৎপর্যে বাঙময়। একুশের আন্দোলনের মূল ভিত রচনা করেছিল বাংলাদেশের শোষিত মানুষেরা। একুশের পূর্বাপর রক্তাক্ত সংগ্রামে রক্তদান করেছে নামহীন শ্রমজীবী মানুষ এবং তাদের সন্তানেরা। একুশের এই নতুন তাৎপর্য হচ্ছে একুশের সমাজতান্ত্রিক তাৎপর্য। শোষিত জনতার পক্ষের সংগ্রামী সৈনিকেরা একুশের এই তাৎপর্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন এবং জীবনের মধ্যে গভীর গবেষণার মাধ্যমে এই তাৎপর্য্যের অজানিত এবং অবজ্ঞাত উপাদানসমূহকে সত্যের আলোয়ে স্থাপন করবেন।

একুশ ব্যর্থ নয়, মৃত নয়। কিন্তু একুশ নবতর মূল্যায়নের দাবী করে নূতন যুগের নতুন সংগ্রামীদের কাছ্ থেকে।

ব্যর্থতা একুশের নয়, বামপন্থী আন্দোলনের

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

একুশে ফেব্রুয়ারী কি ব্যর্থ হয়ে গেছে?

না, হয়নি, যদিও মানতেই হবে যে প্রশ্নটি অমূলক নয়, কেননা ব্যর্থতার কিছু কিছু লক্ষণ মোটেই অস্পষ্ট নয় আজ। একুশে ফেব্রুয়ারী তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি---এটা এক কথা, আর একুশে ফেব্রুয়ারী ব্যর্থ হয়ে গেছে—সেটি আরেক কথা। দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান আছে। সব ফুলে ফল হয়নি, তাই বলে ফলনই ব্যর্থ হয়ে গেল এ আমরা বলতে পারি না, তা প্ররোচনা যতই থাক।

আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল কি? আন্দোলন ছিল ভাষার আন্দোলন। ভাষা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের একটি, ভাষা মানুষের বাঁচবার অধিকারেরই অংশ। একুশে ফেব্রুয়ারী তাই ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আমাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম তার চূড়ান্ত লক্ষ্য যে আজো অর্জন করেনি, সে কী আর বলার অপেক্ষা রাখে? তবু ওই সংগ্রামের পথ ধরে বাংলাদেশ যে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এবং সেই স্বাধীনতাকে যথার্থ স্বাধীনতায় পরিণত করার আন্দোলন যে অব্যাহত আছে সে সত্য আমরা অস্বীকার করি কি করে? একুশে ফেব্রুয়ারী টিকে আছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যে, টিকে আছে বাঙালীদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে।

আন্দোলনের নের্তৃত্বে ছিল কারা? নেতৃত্ব ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সেই শ্রেণী তখন পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়ছিল নিজেদের বিকাশকে নিশ্চিত করবার জন্য। এই লড়াইয়ে ভাষা আন্দোলন সাহায্য করেছে। লড়াই ক্রমশ জোরদার হয়েছে। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা কিন্তু লুণ্ঠন করে নিতে উদ্যত হল ওই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই একাংশ। পাকিস্তানীরা চলে যাওয়ায় শূন্য স্থানে বসে গেল এই শ্রেণী, পেল বিকাশের অবাধ স্বাধীনতা। বলাই বাহুল্য যে এই ধনিক শ্রেণী একুশে ফেব্রুয়ারীর মিত্র নয়, এরাই শত্রু আসলে। নতুন লড়াই ওদেরই বিরুদ্ধে।

একুশে ফেব্রুয়ারীর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, আজ তাঁদের অনেকেই ওর সঙ্গে আর নেই, পারছেন না থাকতে। কারণটা ব্যক্তিগত নয়, কারণটা শ্রেণীগত। ধনী যাঁরা বাংলাদেশে তাঁদের চরিত্র মুৎসুদ্দীর, তাঁরা আত্মসমর্পণ করে আছেন সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির কাছে। সাংস্কৃতিক সামন্তবাদের সঙ্গেও ওঁদের বিরোধ নেই। একুশকে এঁরা কাছে রাখতে চান যখন তখন বুঝতে হবে এঁরা তাকে আটক করে রাখতে চান, একুশের গণতান্ত্রিকতা ও সংগ্রামশীলতাকে হত্যা করে।

বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্দোলনের শত্রুমিত্রের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু বাম আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি। আসলে ব্যর্থতা একুশে ফেব্রুয়ারীর নয়, ব্যর্থতা যদি কারো ঘটে থাকে তবে ঘটেছে বামপন্থী আন্দোলনের। বামপন্থী আন্দোলনের জোর বাড়লে একুশের সার্থকতাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বলা যায় যে এমনকি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার স্বীকৃতিও আনুষ্ঠানিকতার নথিপত্রের ভেতর বাধা পরে আছে, বাংলা প্রচলন সাময়িক শুভেচ্ছা ও উত্তেজনার বাইরে যেতে পারছে না। কিন্তু এই অসাফল্য আসলে ওপরের ঘটনা, এর নীচে আছে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক বিভ্রান্তি। সেই নীচের ঘটনারই প্রকাশ দেখছি ওপরে। একুশে ফেব্রুয়ারী ওপরের ব্যাপার নয়, নীচেরই ব্যাপার, ব্যাপার গভীরের। আমাদের জাতিসত্তার অনুভবে, জাতীয় মর্যাদার চেতনায় এবং গণতান্ত্রিক তথা মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামশীলতার মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক ভাবে আছে। কিন্তু শুধু ঐতিহাসিক ভাবেই নয়, এ আছে প্রবহমান, এমনকি তাৎক্ষণিক রূপেও।

একুশে ফেব্রুয়ারী ব্যর্থ হয়ে গেছে এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণীয় নয়। বিশেষভাবে নয় এই কারণে যে এর মধ্যে হতাশার সুর বড় বেশী প্রবল। হতাশার আচরণ মিত্রের মধ্যেও মিত্রসুলভ নয়, নিতান্তই বৈরীতামূলক।

সর্বত্র শোনা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়ার জয়ধ্বনি

কবীর চৌধুরী

অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

একুশে ফেব্রুয়ারী কি ব্যর্থ হয়ে গেছে? এর উত্তর আমি বলব যে, না, ব্যর্থ হয়নি। তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমি একথাও যোগ করব যে একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন পরিপূর্ণ সার্থকতাও অর্জন করেনি।

বাংলা ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিলো পাকিস্তানের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারী এই আন্দোলন এক ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছিল। সেদিনের স্বৈরাচারী নয়া উপনিবেশবাদী শাসককুল তদানীন্তন পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি পূর্ববাংলার মানুষের তাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিশ্রুত করার ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক দাবীকে বন্দুকের মুখে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এর ফলে ভাষা আন্দোলন স্তব্ধ তো হলই না, স্তিমিতও হল না, বরং আরো বেগবান ও শক্তিশালী হয়ে উঠলো। তখন থেকেই আরেকটা সত্যও স্পষ্টতর হল। ২১শে ফেব্রুয়ারী বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলো, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এটা জনগণের সার্বিক মুক্তির জন্য একটি গণআন্দোলনের রূপ গ্রহণ করল। একুশে ফেব্রুয়ারীর বহুমাত্রিকতার মধ্যে অন্ততঃ দুটিকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায়। একটা সঙ্কীর্ণ, সীমিত, তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। তা হল বাংলাভাষার জন্য সরকারীভাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আদায় করা এবং বাংলাভাষাকে জীবনের সর্বস্তরে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা। এই লক্ষ্যের প্রথমাংশ আনুষ্ঠানিকভাবে অর্জিত হয়েছে, যদিও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার মধ্যেও অনেক ফাঁকি আছে। আর দ্বিতীয়াংশ প্রায় কিছুই অর্জিত হয়নি। একুশে ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি,

যার জন্য প্রয়োজন একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যুদয়। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সেসব উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনেক অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থাকলেও তার মধ্যে কিছু প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা ও খানিকটা আশার আলো ছিল। বর্তমানে, বিশেষ করে ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর, ২১-এ ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের মূল আদর্শ ও ব্যাপকতর লক্ষ্যাবলীর সম্পূর্ণ বিরোধী পথ অনুসরণ করছেন বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার। একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, সেখানে তার প্রধান সার্থকতা। একুশে ফেব্রুয়ারী গণমানুষের সার্বিক মুক্তি আন্দোলনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবসহ অন্যান্য অঙ্গণে আজ অবধি কোন বিপ্লব আনতে সক্ষম হয়নি, সেখানে তার প্রধান ব্যর্থতা।

একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন ছিল বাঙ্গালী জাতিসত্তার প্রেরণাসঞ্জাত আমাদের প্রথম বড় আকারের ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন। আজ নতুন করে ধর্মান্ধতার উন্মেষ ঘটানো হচ্ছে, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সরকারের নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে, সর্বত্র শোনা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়ার জয়ধ্বনি। বিরাশির একুশে এর বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এই আশার মধ্যেই একুশে ফেব্রুয়ারী সার্থকতা-ব্যর্থতার দোলাচলে দোদুল্যমান।

আত্মপ্রসাদ থেকেই জেগেছে আত্মবিস্মরণ

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এসত্য এখন ইতিহাসের অন্তর্গত যে ভাষা-আন্দোলনের ফলেই পাকিস্তানী আমলের বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল রূপান্তর ঘটে। প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রতিবাদী চেতনা ভাষা-আন্দো-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল। পরবর্তী দুটি দশক ধরে একুশে ফেব্রুয়ারী ছিলো সকল স্বৈরাচার-বিরোধী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রেরণা। বস্তুত ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত চেতনা থেকেই আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তা ও পরে স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান।

অনস্বীকার্য-যে স্বাধীনতা-উত্তর কালে একুশে ফেব্রুয়ারী অন্যান্য অনুষঙ্গচ্যুত হয়ে কেবল সাংস্কৃতিক উৎসবের উপলক্ষে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা সম্ভবত ভেবেছিলাম যে ভাষা-আন্দোলনের ইপ্সিত সব লক্ষ্যই সিদ্ধ হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্রের স্থান যেহেতু সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে—সেকারণে আমাদের আর কিছু চাইবার নেই এবং আমরা 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছে গেছি। ভাষা-আন্দোলনের সবচেয়ে স্মরণীয় শিক্ষা—স্বাধীকারের জন্যে প্রচণ্ড স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা—কেবল আমাদের কবিতা, গান, আর অলঙ্কার বহুল বক্তৃতার ঠাঁই পেয়েছিলো।

গত একটি দশকে যে-শিশু কিশোর এবং যে-কিশোর পরিপূর্ণ তরুণ হয়ে উঠেছে সে কি ভাষা-আন্দোলনের সঠিক তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত? মনে হয়, সেই অবহিতির সুযোগই তাকে দেয়া হয়নি। তার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারী বাৎসরিক উৎসব হিসাবে বিবেচিত হলে—তাকে আমরা দোষারোপ করতে পারিনা। আসলে আমাদের আত্মপ্রসাদ থেকেই জেগেছে আত্ম-

বিস্মরণ। এবং সেই বিস্মরণের অবকাশে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে; তাদের প্রতিরোধ করার মতো সংবশক্তিটুকুও সাম্প্রতিক বহুধাবিভক্ত প্রগতিশীল শিবিরে অনুপস্থিত। সেকারণেই নিতান্ত বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালি সংস্কৃতি-বিরোধী ব্যক্তিও অবলীলায় একুশের পদকে ভুষিত হন। তা নিয়ে সামান্য প্রতিবাদ পর্যন্ত উচ্চারিত হয় না।

তখন স্পষ্টতই মনে হয়–যে একুশে ফেব্রুয়ারী ব্যর্থ হয়ে গেছে। অন্তত তার তাৎপর্য আর অটুট নেই।

তথাপি জন্ম ঋণ আর রক্তের ঋণ অবিস্মরণীয় বলেই মনে করি। বিপথগামী সন্তান যেমন তার পিতার কাছে অনুতপ্ত চিত্তে ফিরে আসে- তেমনি আত্মস্বার্থেই একুশের অঙ্গীকারে আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবেই এই আন্তরিক প্রত্যাশা আমার আছে।

অনেক দুঃসময় অতিক্রম করেও আমি আশাবাদী

ক, আ, ই, ম, নুরউদ্দিন

অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

আমার বিশ্বাস একুশের চেতনা বাঙালী জাতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভাষা আন্দোলনের মহান শপথ থেকে বর্তমানে আমরা অনেকটা বিচ্যুত, তবুও আমি বলব একুশে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য এখনো অটুট ও অম্লান। সাময়িক উত্থান-পতন সত্বেও এই মহান ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম ও আন্দোলনে আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। অনেক দুঃসময় অতিক্রম করেও আমি এখনো আশাবাদী।

একুশের চেতনা-সমাজের সর্বস্তরে পূর্ণভাবে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হোক—বিরাশির একুশের প্রাক্কালে তাই হোক আমাদের সকলের একান্ত কামনা।

প্রাতিভাসিক সত্য ও মর্মবস্তুকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে / আবুল কাসেম ফজলুল হক

অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ

যুক্তিহীন অন্ধ আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনেকেই আজকাল বলে থাকেন যে, একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তুপ্রাতিভাসিক ঘটনাবলির গভীরে প্রবেশ করে এই আন্দোলনের মর্মকে যাঁরা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন সফল হয়েছে।

যে কোন আন্দোলনেরই চরিত্র নির্ধারিত হয় মূলত সেই আন্দোলনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। ১৯৫২ সনে একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের যে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল, 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' ছিল যার সাংগঠনিক রূপ, তাতে ছিল প্রধানত তিন ধরণের উপাদান ঃএক, বুর্জোয়া ভাবধারার আলোকে ইসলামি জীবনাদর্শের আধুনিকীকরণে বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট-বিরোধী তমদ্দুন মজলিশ ও খিলাফত রব্বানীর কর্মীরা; দুই, বুর্জোয়া আকাঙ্খা-তাড়িত উদারতাবাদী আপোসকামী আদর্শগত প্রশ্নে সম্পূর্ণ দৃঢ়তাহীন আওয়ামী মুসলিম লীগ ও ছাত্র লীগের কর্মীরা; তিন, কমিউনিষ্ট আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ সাংগঠনিক দিক থেকে নিতান্ত দুর্বল উদারতাবাদী দোদুল্যচিত্ত যুবলীগ ও 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি'র কর্মীরা। এই তিন ধরণের বিরোধী উপাদান নিয়ে গঠিত আন্দোলনের নেতৃত্ব সুদৃঢ়, সুসংঘবদ্ধ ও সুসংহত হতে পারেনি। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত শক্তিসমূহের প্রধানতম অংশই ছিল প্রকৃতপক্ষে মুক্তিকামী শোষিত---নিপীড়িত শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ও অধিকারের বিরোধী। আন্দোলনকে তাঁরা তাঁদের দলগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন,

এবং পরবর্তী কালে আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুবিধা অনুযায়ী কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির জন্মদানে সচেষ্ট হয়েছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের পরবর্তী যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা আন্দোলন এবং ৫৪-র নির্বাচন সম্পর্কেও একই কথা। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল সামন্ত আদর্শের অনুসারী নেজামে ইসলাম, বুর্জোয়া ভাবধারার আলোকে ইসলামের আধুনিকীকরণে বিশ্বাসী খিলাফতে রব্বানি, বুর্জোয়া আকাঙ্খা-তাড়িত উদারতাবাদী আপোষকামী আদর্শগত প্রশ্নে সম্পূর্ণ দৃঢ়তা-হীন আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক---শ্রমিক পার্টি এবং কমিউনিষ্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ সাংগঠনিক দিক থেকে দুর্বল উদারতাবাদী গণতন্ত্রী দল নিয়ে। এসব বিরোধী উপাদান নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সুদৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হতে পারেনি। দলগত ও শ্রেণীগত স্বার্থে বিভিন্ন দল জনগণকে ব্যবহার করতে চেয়েছে শুধু---জনগণের সমস্যার সমাধান করার কথা ভাবেনি।

পরবর্তী কালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে ছয় দফা আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে, মর্মের দিক থেকে তাও ছিল পূর্ববর্তী ধারারই সম্প্রসারণ মাত্র। 'বাংলার দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচনে'র প্রতিশ্রুতি এই আন্দোলনের নেতাদের বক্তৃতা--বিবৃতির উপজীব্য হলেও তাঁদের আদর্শগত লক্ষ্য ছিল এই ভূখণ্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশ, বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, কখনও জাতীয় আবার কখনও মুৎসুদ্দি চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে।

পরবর্তী কালের বাকশাল ও 'দ্বিতীয় বিপ্লব' এই ভূখণ্ডে বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্রের বিকাশেরই এক পর্যায়ের অনিবার্য পরিণতি। বর্তমান বি,এন,পি, নেতৃত্বও বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও সেই স্বৈরতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের দেশের বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের নামের সঙ্গে মুৎসুদ্দি, জাতীয়, আমলা, ফড়িয়া, লুঠেরা, বড়, মাঝারি, ক্ষুদে, আলোকপ্রাপ্ত, অমার্জিত, দৃঢ়চিত্ত, দোদুল্যচিত্ত, উদীয়মান, ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি নানা বিশেষণ ব্যবহৃত হতে পারে। তবে সাধারণভাবে ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সমাজে বুর্জোয়াদের প্রতিপত্তি ও স্বৈরাচার বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এই ভূখণ্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের এবং একুশে

ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের ও উত্তরকালের বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃবর্গের আশা-আকাঙ্খা, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র লক্ষ্য করলে একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের বুর্জোয়া-আশা-আকাংখা তাড়িত বুদ্ধিজীবীরা ও রাজনৈতিক নেতারা এই আন্দোলনের সাফল্য ব্যাখ্যা করে বক্তৃতায় ও বিবৃতির মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ বলে আসছেন যে "ভাষা আন্দোলনের "চূড়ান্ত পরিণতিই' ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।" এই উক্তিতে নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে তাঁদের গর্ববোধের পরিচয় আছে।

তবে একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের অন্য দিকও আছে, এবং সেসব দিকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, এই আন্দোলনে বিভিন্ন স্তরের জনগণের অংশ গ্রহণের এবং আশা-আকাঙ্খার দিক। প্রতি বছর বিভিন্ন নেতৃত্বের অনুসারী কিংবা দল-নিরপেক্ষ যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র, চাকুরীজীবী, শ্রমিক, কৃষক ও বেকার একুশে ফেব্রুয়ারীতে খালি পায়ে প্রভাত ফেরীতে শামিল হয়, সভা-সমাবেশে যোগদান করে, অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে, শ্লোগানের প্রতিধ্বনি তোলে, তাদের ভূমিকা এবং তাদের আশা-আকাঙ্খা, উদ্দেশ্য ও সাফল্য-ব্যর্থতার দিক থেকেও একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সে-ব্যাখ্যা দানেরও কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন, আমি নিজেও সে-চেষ্টা অন্যত্র করেছি। কেউ আগ্রহী হলে একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের সে দিকটিও বিবেচনায় ধরতে পারেন। অবশ্য মুক্তিকামী মানুষকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে সে দিকটি বিবেচনায় আনা হয়।

প্রত্যেক বস্তুর, প্রক্রিয়ার ও ব্যাপারেরই প্রাতিভাসিক সত্য এবং মর্মবস্তু---উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করে দেখার প্রয়োজন আছে। একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন ও আমাদের দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করতে হলে এই প্রয়োজন সম্পর্কে পরিপূর্ণ সতর্কতা দরকার।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর থেকে একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনটি যদি ঈদ উৎসব, মহররম পর্ব, দূর্গাপূজা, স্বরস্বতী পূজা, খৃষ্টমাস ডে, নববর্ষ, বসন্তোৎসব---প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দিনের মত একটি দিনে পর্যবসিত হয়ে গিয়ে

থাকে, তাহলে তার জন্য দুঃখিত হওয়ার কিংবা হতোদ্যম হওয়ার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু ঈদের দিনের সমান গুরুত্বও কি একুশে ফেব্রুয়ারী পাচ্ছে? বিচিত্রা, রোববার, সন্ধানী, চিত্রালী, পূর্বাণী প্রভৃতি পত্রিকা এবং টেলিভিশন, রেডিও ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম ঈদের দিনের তুলনায় একুশে ফেব্রুয়ারীকে গুরুত্ব অনেক কম দেয়।

যাঁরা মুক্তিকামী তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে চাইঃ ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত বাঙালী জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারীর যে তাৎপর্য ছিল, তেমন তাৎপর্যে মণ্ডিত একটি নতুন দিনের উদ্বোধন ঘটাতে হবে।

আঘাত আসছে আধিপত্যবাদ, বুর্জোয়া অসংস্কৃতি ও স্বৈরাচারের কাছ থেকে / মাহমুদুর রহমান মান্না

বিদায়ী সহ-সভাপতি, ডাকসু

যে কোন সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তিভূমি হচ্ছে সেই সমাজে বিরাজিত দ্বন্দ্বসমূহ, যার নিষ্পত্তির লক্ষ্যেই গড়ে ওঠে আন্দোলন। একটা সমাজে অনেক দ্বন্দ্ব বিরাজ করে যার একটিকে কেন্দ্র করেই অন্য দ্বন্দ্বসমূহ আবর্তিত হয়, পরিচালিত হয় এবং অবশেষে পরিবর্তিত হয়। এ দ্বন্দ্বই হোল সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্ব।

ভাষা সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্ব নয়, বায়ান্নোর ভাষার দ্বন্দ্ব আবর্তিত ছিলো তখনকার প্রায় উপনিবেশিক সমাজকাঠামোকে কেন্দ্র করেই যা সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনে অনাগ্রহী, বুর্জোয়া কিংবা সংস্কারবাদী রাজনীতিবিদদের কাছে ধরা পড়েনি, কিংবা ধরা পড়লেও তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দু-একটি দেশে উল্লেখযোগ্য ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হলেও একারণেই স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়নি। কিন্তু তখনকার পূর্ব বাংলায় এ ভাষা আন্দোলন পরিণতি পেয়েছিলো স্বাধীনতা আন্দোলনে। একুশে ফেব্রুয়ারী ব্যর্থ হয়ে গ্যাছে একথা বলবার কোন অবকাশ এখানে নেই। বরং উপরোক্ত বিবেচনায় ভাষা আন্দোলন তার সফল, যৌক্তিক পরিনতিতে উপনীত হয়েছে।

বিরাশীতে একুশ আমাদের সমাজজীবনে তাৎপর্যহীন, অবসিত কিনা এ প্রশ্নের জবাব আর একটু গভীরে গিয়ে খুঁজতে হবে। ভাষা সমাজের মূল কাঠামো নয়, এর অধিকাঠামো। ভাষার আন্দোলন তাই সরাসরি সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন না হলেও কাঠামো অধিকাঠামো দ্বান্দ্বিকতার নিয়মেই সম্পর্কিত। ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণতি লাভ করলেও মূল কাঠামো বদলায়নি। তাই সে ক্ষতিকর প্রভাব রাখছে অধিকাঠামোতে।

ভাষার আন্দোলন সে জাতীয় সংস্কৃতি এবং স্বাতন্ত্র্যের বিজয় সূচিত করেছিলো, তারই উপর আঘাত আসছে আধিপত্যবাদ বুর্জোয়া অপসংস্কৃতি ও স্বৈরাচারের কাছ থেকে আত্মানুসন্ধান এবং আত্মবিশ্লেষণই আমাদের এই চেতনায় উপনীত করে। এই উপলব্ধির অনুপস্থিতিই স্বৈরাচারী শক্তির উত্থান, পরাভূত ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরাবিভাব, মুক্তিযুদ্ধের অবমূল্যায়নকে সম্ভব করে তুলবে। এই চেতনার দারিদ্রই একুশকে ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে সাংবাৎসরিক উৎসবে পরিণত করবে। ভাষা আন্দোলনের মহান বিজয়কে ভাস্বর করে রাখতে হলে, তাই এই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন চাই, চাই সমাজবিপ্লব। এই চেতনা এবং ক্রিয়ার আধিপত্যই একুশকে যোগ্যতম ব্যঞ্জণায় অভিষিক্ত করবে।

ইতিহাসের পাঠ নিতে ব্যর্থ হলে একুশ নিস্ফল হয়না

মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ

''একুশে ফেব্রুয়ারীর'' তাৎপর্য আজ তো শেষ হয়ই নি বরং তা আজ আরো উজ্জ্বল ও আরো শিক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

একুশের কাছ থেকে আজ আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবো ?

একুশের আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ব ঠিক নয়---ঠিক হচ্ছে ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যভিত্তিক জাতি তত্ত্ব। প্রমাণিত হবে, যে কোন ন্যূনতম দাবিতে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা হলে তা শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না তার সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত হয় আরো অগ্রসর দাবীসমূহ। একুশের সূত্রপাত হয়েছিল ''অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'' শ্লোগানের মাধ্যমে কিন্তু তা অনিবার্যভাবে গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন এবং সর্বপ্রকার নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। একুশ এটাও শেখায় যে যদি শুধু সংকীর্ণ সাংস্কৃতিক দাবীর মধ্যে ভাষা আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাক্‌তো তাহলে তা অনিবার্যভাবে তাৎপর্যশূন্য হয়ে পরতো। একুশ আমাদের শেখাচ্ছে কিভাবে আন্দোলনকে ধাপে ধাপে অগ্রসর করে নিতে হয়। প্রথমে তত্ত্বগত বিভ্রান্তি দুর করা, সুস্পষ্ট শ্লোগান উত্থাপন, বিভিন্ন শক্তির ঐক্যস্থাপন, আংশিক ধর্মঘট, পুর্ণধর্মঘট, হরতাল এবং অবশেষে প্রাণ দান---এই ক্রমঅগ্রসরমান আন্দোলনের পথ একুশ আমাদের দেখায়।

তবে যদি কতিপয় বিভ্রান্ত ব্যক্তি ও দল ইতিহাসের পাঠ নিতে ব্যর্থ হয়, তবে একুশ তাতে নিস্ফলা হয়ে যায় না। বরং শিক্ষা নিতে অক্ষম ব্যক্তিদের অক্ষমতাই তাতে প্রকাশিত হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ এইসব স্খলন পাপীদের শ্রেণীচরিত্র ও স্বভাবই এর পিছনে কাজ করছে।

একুশের কাছে প্রত্যাশারও সীমারেখা আছে/ সুব্রত শংকর

কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে আর সব ঘটনা পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার বিচার বিশ্লেষণ একদিকে যেমন অসংগত, তেমনি এ'ধরণের কোন ঘটনা সম্পর্কে চূড়ান্ত কথাটি বলে দেয়াও অসমীচীন।

ভুলটা হয় তখনি, যখন আমরা একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনকে আমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র ভাষা আন্দোলন হিসেবে দেখি, আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের সোপান হিসেবে দেখতে ব্যর্থ হই। একুশ আমাদের স্বাধীনতার পূর্বকালের প্রতিটি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রেরণার উৎসমুখ, আমাদের সাহসের ঠিকানা। একটি একুশ ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ এদেশ থেকে নির্বাসিত হয়নি। সর্বোপরি একটি একুশ আমাদের চেতনাকে শাণিত রেখেছিলো বলেই খুব তাড়াতাড়ি আমরা একটি স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে এগিয়ে গেছি।

মানুষের মন ঐতিহাসিক উপায়ে বিকাশমান সংস্কৃতিরই প্রসূন। আমি কি বলছি, কেমন করে বলছি, কি ভাবছি, কেমন করে ভাবছি, তার সবকিছুই নির্ভর করছে আমার অভিজ্ঞতার পরিবেষ্টনের উপর, আমার সংস্কৃতির ধাঁচের উপর। ভাষা সেই সংস্কৃতিরই বাহন। একটি একুশে ফেব্রুয়ারী না এলে আজকে হয়তো আমার উচ্চারণের ঢংটি যেতো বদলে। আমার এই লেখার বাংলা হরফের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো আরবী হরফ, সর্বোপরি, আমার এখানে বলা কথাগুলো কোনদিনই বলা হতো না। শুধু সুযোগ হতোনা বলেই নয়, হয়তো মানসিকতাটিও গড়ে উঠতোনা। আমার আমিত্বের এতখানি জুড়ে যে একুশে ফেব্রুয়ারী, তাকে আমি ব্যর্থ বলি কেমন করে? একুশে ফেব্রুয়ারীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে কি হওয়া উচিত ছিল এবং হয়নি সে কথা আমরা অবশ্যই ভাববো, কিন্তু কতটুকু ক্ষতি হতে পারতো একটি একুশে ফেব্রুয়ারী না এলে, সেদিকটিকে উপেক্ষা করে নয়।

আমি একুশে ফেব্রুয়ারীর উৎসবসর্বস্বতার বিপক্ষে, কিন্তু উৎসবের বিরুদ্ধে নই। একুশ আমার চোখের সামনে ঘটা কোন ঘটনা নয়। সে সময়কার আন্দোলনের ইতিহাস পড়েছি অনেক পরে। আমার একুশের চেতনা গড়ে উঠেছে খুব ছোটবেলা থেকে ভোর রাতে সবার সাথে নগ্নপায়ে প্রভাতফেরীতে হেঁটে, সবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গেয়ে। স্বাধীনতার দশ বছর পর যখন নৈরাজ্য এবং প্রতিক্রিয়া এক প্রবল প্রতিপক্ষ তখন---যে শিশুস্বাধীনতার পর জন্মেছে তার জন্যে এই অনুষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয়তা আরো অনেক বেশী।

আমরা একটি বন্ধ্যা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শক্তি যখন ক্ষমতায় আসীন, স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত মূল্যবোধগুলো যখন অবলুণ্ঠিত, জনগণ যখন সীমাহীন সমস্যায় জর্জরিত, তখনও দেশে কোন আন্দোলন গড়ে উঠছেনা সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে। সেই নেতৃত্ব গড়ে উঠেনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতি, তৎকালীন নেতৃত্বের চরিত্রের কারণে, স্বাধীনতা উত্তরকালে বিভিন্ন কারণে শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত না হওয়ার ফলে। কিন্তু সে ব্যর্থতা কি একুশে ফেব্রুয়ারীর ?

একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন ছিল ঔপনিবেশিক শাসনকালে জাতীয়তাবাদী বোধে উদ্দীপ্ত একটি আন্দোলন, কোন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নয়। সে সময়ের নেতৃত্ব এবং বর্তমান নেতৃত্বের প্রকৃতি এক হবার কথা নয়, হওয়া উচিতও নয়। কাজেই রাজনীতিতে বর্তমান স্থবিরতার দায়িত্ব একুশে ফেব্রুয়ারী কেন নেবে ? একুশের কাছে আমাদের প্রত্যাশারও সীমারেখা আছে। আন্দোলনের সেই স্তরে একুশে ফেব্রুয়ারীর কাছ থেকে এতখানি আশাও করা হয়নি। একুশে ফেব্রুয়ারীতে সূচিত বিজয়গুলো অর্থহীন হয়ে যেতে পারে, যদি ইতিহাস এই এখানে এসেই রুদ্ধ হয়ে যায়, তবেই। কিন্তু তা' কি হতে পারে কখনো ?

একুশে ফেব্রুয়ারী আপাততঃ ব্যর্থ হয়েছে / কবির আশরাফ

মাতৃভাষাপ্রীতি নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক আধিপত্যের আতংক। সবেমাত্র সমৃদ্ধি ও আরামদায়ক জীবনের স্বাদ পাওয়া বাঙালী মধ্যবিত্ত উর্দুর ভেতরে নিজেদের জায়মান সমৃদ্ধির মৃত্যুঘণ্টা শুনতে পেয়েছিল। সেজন্যেই সূচনা ভাষা আন্দোলনের। পরবর্তী সময়ে বেড়ে ওঠা তরুণ সম্প্রদায় সেই আন্দোলনের আবেগ ও স্মৃতিকে বহন করেছে শুধু। একই কারণে।

বর্তমান প্রেক্ষিতে একুশ অন্তত স্বাধীনতাপূর্বকালীন আবেদনসম্পন্ন একুশ নয়। অনেকখানি জোলো, অনেকখানি নির্জীব। কারণ এখন যারা বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক এবং অর্থনৈতিক সুবিধার সিংহভাগ ভোগকারী সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলাভাষার মধ্যে আর তেমন সুখের প্রতিশ্রুতি পাচ্ছেনা। আর নিজেরাই যেহেতু সমাজের সবচে বেশী সুবিধাভোগী শ্রেণী তাই তারা আন্দোলনবিমুখ এবং স্বকীয় অবস্থানকে দৃঢ়ীকরণ ও উন্নয়নের স্বার্থে ইংরেজীর পৃষ্ঠপোষক।

এদেশের রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যেহেতু মধ্যবিত্তেরই সেজন্যেই একুশে ফেব্রুয়ারীর অর্থনৈতিক ও ভাষাগত দুটো তাৎপর্যই এদের কাছে আবেদনহীন প্রায়। আবেগের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে কোন ঘটনাই বা মূল্যবান থাকে? প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সাম্প্রদায়িকতার পুনর্বাসন একুশের স্মৃতি অপনয়নে তৎপর, সেটা সত্য। আরো বেশী সত্য এটাই যে ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীলতা শেকড় গাড়ছে সংস্কৃতির গভীরে। এজন্যে দায়ী একুশের পক্ষে যারা, তাদের একটি বড় অংশের বিভেদ, পদস্খলন এবং সুবিধাবাদী চরিত্রে। এদেরকে যদি বিনাযুদ্ধে ভূমি ছেড়ে দেয়া হয়, সেই ফাঁকে বাড়তে থাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা, তাহলে ধরেই নেয়া যায়, একুশে ফেব্রুয়ারী ব্যর্থ হয়ে গেছে আপাততঃ।

শ্রেণী সংগ্রামের পথই একুশের নবতর ব্যঞ্জনা

সলিমউল্লাহ খান

'সচেতন ও প্রাগ্রসর' এবং 'চিন্তাশীল ও বিবেকবান'---এই দুই জোড়া সদগুণ যদি আজ আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের মায় যাদের কাছে এই প্রশ্নলিপি পাঠাচ্ছেন তাদের বেশির ভাগেরও সত্যি সত্যি থাকত, তবে কি এই প্রশ্নের কোন প্রয়োজন ছিল? আপনাদের সওয়ালের মধ্যেইত জবাবের আধখানা রয়ে গেছে। হয়তো সন্দেহ আছে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে কিনা। কিন্তু আংশিক ব্যর্থ যে হয়েছে কিংবা ব্যর্থ বলে মনে যে হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। আজ অন্ততঃ আপনাদের মনে এ অসওয়াসা জেগেছে দেখেইত বুঝতে পারা যায়, দেশের লোক একুশে ফেব্রুয়ারীর সার্থকতা সম্পর্কে অনিশ্চিত।

খুব সম্ভব প্রশ্নটা আসছে তার প্রেরণার সাফল্য বৈফল্য নিয়ে নয়, আসছে ফলাফলের দিক থেকে। ফলাফলের কি ব্যর্থতা তা ত আপনাদের চেয়ে বেশি গুছিয়ে আমি বলতে পারব না। তা ত স্পষ্টই। সেই জন্য প্রেরণাকেও কিছু প্রশ্ন করতে হয়। ফেব্রুয়ারীর উদ্দেশ্য যদি হতো বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা মাত্র তবে এক অর্থে তা ত সফলই। তদুপরি রাষ্ট্রও একটা স্বাধীন হয়েছে এক রকমের। যদিও সংবিধানের স্বীকৃতি, কাগজের লেখনের সাথে ব্যবহারের বাস্তবতা ও কাজের প্রয়োগে ব্যবধান দুস্তর আছেই। ইংরেজী শিখে যতটুকু চাকরির সুবিধে পাওয়া যেত, ইংরেজী বাদ দিয়ে গ্রামাঞ্চলের লোকসাধারণ সেটুকুও হারাচ্ছেন। বাস্তবে ইংরেজী জানেওয়ালাদের আধিপত্য স্বীকৃত সর্বত্র এবং প্রশংসিতও কোথাও কোথাও। এছাড়া মোটামুটি বাংলার জয় জয়কার ত রয়েছেই।

তবে বৈফল্যের কথাটা উঠছে কেন? আমার মনে হয় প্রেরণাকে জিজ্ঞেস করতে হবে সে কথা। কুসংবাদ, কথায় বলে, বাতাসের আগে ধায়।

আমার মনে হয়, কুসংস্কারও কিছু কম গতিসম্পন্ন নয়। একুশে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কেও কথাটা খাটে। ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে বড় যে কুসংস্কারটি বাজার ছেয়ে আছে তার মানে অনেকটা এই যে, আন্দোলনটা হয়েছিল বুঝি নিছকই ভাষার জন্যে। আসলে এতদিন পরও একথা অস্পষ্ট থাকে কি করে ভেবে বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আন্দোলনটা মূলতঃ ছিল জাতীয়তার, আত্মপরিচয়ের। তার মর্মে কি ছিল? মর্মটা অতি অবশ্যই সামাজিক। অর্থনৈতিক অধঃস্তনতার হাত থেকে মুক্তির। যে কোন দেশে, যে কোন কালেই অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনও ভাবাদর্শের পতাকা বহন করে। সে ভাবাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় দেখা দেয়। ভাবাদর্শের দোষগুণের মধ্যেই আন্দোলনের ভবিষ্যত পরিণতির বীজ অনেকখানি গোপন থাকে।

পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে পূর্ববাংলার সর্বসাধারণ কেন সমর্থন জানিয়েছিলেন? তারা মূলতঃ আত্মপরিচয়, তথা অর্থনৈতিক মুক্তির ভিত্তি অন্য কথায় উন্নত জীবনের সম্ভাবনাকেই সেখানে দেখছিলেন কিংবা দেখছিলেন বলে তাদের মনে হচ্ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র ও জমিদাররা ছিলেন শোষক। ক্ষোভটা শোষকদের ওপরই। আবার জমিদাররা শুধু শোষক কিংবা শুধু জমিদারই নন, তারা ছিলেন হিন্দুও। হিন্দু--জমিদার--শোষক। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির ভাবাদর্শে হিন্দু কথাটাই পার পেয়েছে বেশি। জমিদার ও শোষক কথাটা ছলের ভেতর চাপা পড়ে গেছে। জনগণের আকাংখায় কোন ভুল না থাকলেও, ভাবাদর্শের (তদনুসারে উণ্থিত সংগঠনেরও) এই ফাঁক দিয়েই দেখা সম্ভব ছিল পাকিস্তানের পরিণতি কোথায় পর্যন্ত বাড়তে পারে। এখন তা ইতিহাসের অন্তঃপাতী, স্কুল ছাত্রদেরও মুখস্থ সূচি।

পাকিস্তানের ফেরেব্বাজিটা আজ ধরা পড়ছে যত সহজে, ১৯৪৮ কি '৫২ সনে এত সহজে পড়েনি সকলের চোখে। একইভাবে ১৯৭১ সনেরও একটি বড় ফাঁকি থেকে গেছে যা আজ খুব কম জনেরই চেতনায় ধরা পড়ছে। তবে ভবিষ্যতের কোনও একদিন সেটিও ধরা পড়বে, অচিন পাখি চিন হবে। আজ যদি আমরা ১৯৭১-এর ফাঁকিটা বুঝি, তবে একুশে ফেব্রুয়ারীর বৈফল্যের কারণটাও বুঝব।

একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের সূচনা যারা ঘটিয়েছিলেন, তারা সে বিষয়ে সচেতনই থাকুন আর অসচেতনই থাকুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা পূর্ব

বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির কথাটাই বলছিলেন। আন্দোলনের প্রকাশটা সাংস্কৃতিক ছিল বলেই মর্মবস্তু অনুপস্থিত বলা চলে না। প্রকাশরূপের এই প্রকারভেদটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই আন্দোলন যে পথ ধরতে বাধ্য হয়, তাতে ষোল আনা সত্যের প্রতিফলন ঘটেনি। ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি পয়লা যারা তুলেছিলেন, পরবর্তীকালে নানা কারণে (সে কারণ ব্যাখ্যার জায়গা এটি নয়) তারা সে দায়িত্ব পরিচালনার ভার হারান। কিন্তু দুই অর্থনীতি তত্ব ও ছয়দফার মাধ্যমে নতুন পরিচালনাকারীরা এই দাবির একটি অংশকেই মাত্র প্রাধান্য দান করেন। ফলে ১৯৫২ যখন ১৯৭১ এসে উপনীত, তখন সেই আংশিকতারই জয় সূচিত হয়। মূল অংশ তলায় থিতিয়ে থাকে। আজও আছে। থাকার ফলে সফল অংশটুকুও অনিশ্চয়তার হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে।

সহজ করে বললে দেখা যায়, পাকিস্তান যে পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশের মতো লুটেপুটে খাচ্ছিল, তার একটি বহিঃপ্রকাশ ও উপায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য। তাই উপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলন ভাষা সংগ্রামেই প্রথম মূর্তি লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, এই উপনিবেশিকতা, দুই অংশের মধ্যে রাজা-প্রজা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তাকে মদদ যোগানোর পেছনে কোন শক্তি কাজ করছিল তা আমরা তখন আমল করিনি। প্রথম দিকে পূর্ব পশ্চিম বৈষম্যটা চোখে এসেছিল তারাও পর্যন্ত এদিকটা ভুলে ছিলেন কি ভুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ যখন বঙ্গোপসাগারে ক্ষুধার্ত হাংগরের মতো ছুটোছুটি করছিল, তখনই মাত্র মানুষ একটিবার টের পায় গভীরতর শত্রুকে যথাযথভাবে মোকাবেলা করা হয়নি। মানুষকে চেতনার দিক থেকে প্রস্তুত করা হয়নি। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে উপনিবেশিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে মার্কিন সাহায্য ও নির্দেশ (Functional inequality for growth theory) বা এক কথায় বিশ্ব পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের কার্যকারিতার কথাটা ছ'দফা পন্থীরা ভুলেও লক্ষ্য করেননি। কাজেই পাকিস্তানীদের আমরা হটিয়ে দিয়েছি বটে। কিন্তু মার্কিনীদের টিকিটিও ছুতে পারিনি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জনগণকে জানতেও দেয়া হয়নি। পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়িগুলির মত অন্য সব স্থানও আমাদের

দেশীয় স্বার্থপর শ্রেণীটি দখল করেছে মাত্র। মার্কিনীরা (তথা সাম্রাজ্যবাদ) তবিয়তেই ছিলেন। পাকিস্তানী সেনাদের আত্মসমর্পণের পর তাজউদ্দিন আহমদ মার্কিন সাহায্য গ্রহণ না করার ঘোষণা দেন। কিন্তু শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের পর অবস্থা পূর্ববৎ চালু হয়। শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ অধিকতর প্রকাশ্য ও নগ্নভাবে তার আসন গেড়েছে আমাদের সমাজে। আজকের একুশে ফেব্রুয়ারীর যতটুকু বৈফল্য তার সাথে এর সম্পর্কটা সাক্ষাৎ না হলেও নিঃসন্দেহে অপ্রত্যক্ষ।

১৯৭১-এ যে স্বাধীনতা মানুষ চেয়েছিলেন, ১৯৫২-র আন্দোলন তার বীজ বপন করে। ভাষা শুধু ভাষার জন্যে নয়, জীবনের জন্যে। ভাষার জন্যে সংগ্রাম তাই জীবনের জন্যে বাজি। তদ্রুপ স্বাধীনতাও শুধু স্বাধীনতার জন্যে হবে কেন? তা-ও উন্নততর সামাজিক জীবনের জন্যেই। স্বাধীনতার আগে দুই অর্থনীতি তত্ত্বের প্রবক্তারা বোঝাতেন পূর্ব বাংলার উদ্বৃত্ত পশ্চিমে পাচার বন্ধ হলে সঞ্চয় হবে, তা থেকে দেশ উন্নত হবে। স্বাধীনতার পরও তা'ই বলা হল। যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতিটা পূরণের পরই তা হতে শুরু করবে। কিন্তু পাকিস্তানে সম্পদ পাচার বন্ধ হওয়ার পরও অবস্থার কোন উন্নতির লক্ষণ তো দেখা গেলই না, অধিকন্তু সম্ভাবনাও দূরে সরতে থাকলো। কেন এমন হলো?

যে শ্রেণীটা পাকিস্তানের প্রাধান্য খর্ব করে স্বায়ত্ত্বশাসন চাইছিলেন, তারা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি। তাদের গড়ে ওঠার পেছনে পাকিস্তানের হাতটাও অদৃশ্য নয়। তবু তারা পাকিস্তানের ভেতর স্বায়ত্ত্ব হতে না পেরে বাংলাদেশ আয়ত্ব করলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারা এক পা'ও অগ্রসর হলেন না। আজ বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ গভীরতর শিকড় ছড়াচ্ছে, আজকের শাসক শ্রেণী শুধু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই তল্পিবাহক নন, তাদের তল্পিবাহকদেরও তল্পিবাহক। বাংলাদেশের জন্মেরই যারা অসহিষ্ণু শত্রু ছিলেন, তারাই এখন দেশের বিধাতা। সৌদি আরব, পাকিস্তান ও চীনের নেতৃত্ব এখন বাংলাদেশের মুরুব্বী। মুক্তিযুদ্ধ এবং সেই সূত্রে একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাবাদর্শ অবিদ তারা খোল নলচে বদলে ফেলতে তৎপর। তাকে যাদুঘরে পাঠাতে ব্যস্ত। এদের এই পুনরাগমন সম্ভব হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। এই প্রক্রিয়া ১৯৭৫-এর পর ন্যাংটো ভাবে দেখা দিচ্ছে। তবে এর সূত্রপাত ১৯৭২ সনেই। সত্যের সকল

ছাত্রকেই এই তথ্য মানতে হয়। সাংবাৎসরিক উৎসব হওয়াটা খারাপের কিছু না, কিন্তু ফেব্রুয়ারীর এই বাসন্তী রঙ পরিধান, এই উৎসব সর্বস্বতা আজ জাতিকে ম্লাণ করে দিচ্ছে, নীরক্ত পাংশুতার মুখচ্ছবি আজ একুশের প্রাণহীন সভাসমিতি।

তবে এই যে আপনারা প্রশ্ন রাখছেন এতেই আমি আশার ক্ষীণ দীপশিখা দেখি। একুশ এখনও পুরো ব্যর্থ হয়নি। অবসিতও হয়নি। তার তাৎপর্য নতুনতর ব্যঞ্জণায় অভিষিক্ত এই অর্থে যে চেতনার ফাঁকিটা বাস্তবে ধরা দিচ্ছে। আমরা প্রকৃত পরিচয়ে সংগ্রামটা শুরু করতে পারি। ভাবাদর্শের জগত আর মর্মবস্তুর পৃথিবীর মধ্যে ফাঁকটা কমে আসছে। এই নতুন সংগ্রামের অর্থ, আমার মতে, শুধু রাজাকার---আলবদর পাকিস্তানী সৌদী আরবের বিরুদ্ধে সংগ্রামই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও। সাম্রাজ্যবাদ কোন হাওয়াই কথা নয়। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি আমাদের শাসক শ্রেণীর মধ্যে, তার রাষ্ট্রযন্ত্র, সামাজিক অবস্থান ও ভাবাদর্শেই খুব বেশি বর্তমান। তাকে সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানলে সাম্রাজ্যবাদের কবর এই দেশেও রচিত হবে। সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি এখানে পরোক্ষ। সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক ভিত্তি আমাদের শাসক তথা ধনিক শ্রেণীতে। সম্প্রতি সে মাঝারি ধনিক তথা পেটি বুর্জোয়ার মধ্যেও প্রবলবেগে প্রবেশ করছে নতুনভাবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাই আজ আমাদের, শ্রেণী সংগ্রামও বটে। শ্রেণী সংগ্রামের পথই আজ একুশের পথের নবতর ব্যঞ্জনা।

চেতনা-শিখার দীপ্তিকে বাড়াতে চাই/সৈয়দ আখতার মাহমুদ

এই প্রশ্নের কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব দেবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু প্রশ্নটার সম্মুখীন হয়ে কয়েকটা ছোট অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লো। সেগুলোই বরং তুলে ধরি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচচ ডিগ্রী পাবার পর একটি প্রশ্ন বারবার আমাকে শুনতে হচ্ছে 'বিদেশে যাচ্ছেন কবে।' কেন বিদেশে যাবো সে প্রশ্নের উত্তরও অভিন্ন। দেশের কোন সম্ভাবনা নেই, দেশে থেকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাটা মূর্খতা। তাই প্রথম সুযোগেই বিদেশে চলে যাওয়া উচিৎ, পি, এইচ, ডি, করে বিশ্ব ব্যাংকে অর্থনীতিবিদ হবার স্বপ্ন দেখাটাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতি এই আসক্তি দেখিয়েছেন আরো একজন, সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যিনি ছিলেন অন্যতম প্রার্থী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লোপ পাচ্ছে এই প্রবণতায় দুঃখীত প্রার্থী দেশের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা বলতে যেয়ে বার বার উদ্ধৃতি দিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট থেকে, নিজের দেশের কোন কোন অর্থনীতিবিদের লেখা থেকে নয়।

বাংলাদেশে রঙীণ টেলিভিশনের আবির্ভাবে দেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন আমার এক বন্ধু। সেদিন নিউজ উইক (News Week) পত্রিকায় বাংলাদেশকে 'Permanent Disaster Area' বলা হয়েছে দেখে সে মত পাল্টিয়েছে যদিও দেশের পত্র-পত্রিকাতেই অনেক আগে থেকেই এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছিল কিন্তু বন্ধুটির তা বিশ্বাস হয়নি।

সেদিন গিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধের উপরে লেখা গানের একটি ক্যাসেট কিনতে। কিন্তু দোকানদারের যেখানে মিনিট দুয়েক সময়ও লাগেনি Boneyem-এর একটি ক্যাসেট দিতে, সেখানে মুক্তিযুদ্ধের গানের উপর ক্যাসেট বের করতে যেয়ে তিনি হন গলদঘর্ম।

এই যে নিজেদের সবকিছুকে অবজ্ঞা করা, সবকিছুকে খাটো করে দেখবার প্রবণতা— সেটা ক্রমেই নিজেদের মধ্যে বিস্তৃত হচ্ছে। নিজের দেশের প্রতি যে শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে, ভবিষ্যত সম্ভাবনার উপর যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি সেটা দেখেই এ প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দিতে কষ্ট হচ্ছে। একুশ তো বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য আসেনি—এসেছিল বাঙালী হিসেবে নিজেদের পৃথক স্বত্তার উপর আস্থা আর নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস গড়ে তুলবার জন্য। অথচ আজ যা কিছু নিজের তার উপরেই অবিশ্বাস আমাদের বেশী। এই হীনমণ্যতা আমাদের কাটেনি বরং বেড়েই চলছে। আমরা আজ বাংলায় কথা বলছি ঠিকই কিন্তু বাঙালী হিসেবে গর্বিত নই। সেই অর্থে একুশ হয়তো ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থাকে। উপরে যে মূল্যবোধের কথা বললাম, সেটা তো সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া আমরা মূল্যবোধের পরিবর্তন আশা করতে পারি না। কিন্তু একুশের আন্দোলন কি সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন ছিল?

তবু এটা ঠিক যে একুশের চেতনার শিখা আমাদের যাত্রা পথের পুরোটা না হলেও অনেকখানি আলোকিত করবে। সেই শিখা কি একেবারেই নিভে গেছে? আমার মনে হয় না, সেটা ক্ষীণ হয়েছে মাত্র। কিংবা নিজেদের দৃষ্টি শক্তি দৈন্যের জন্য দেখতে পাচ্ছিনা। দৃষ্টিকে তাই প্রখর করতে চাই, সেই শিখার দীপ্তিকে বাড়াতে চাই। আমার বিশ্বাস সেই সময় এখনও আছে।

জাতিসত্তার ব্যাখ্যা শ্রেণী নিরপেক্ষ হতে পারেনা

মনিরুল ইসলাম খান

জাতিসত্তা বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিবিধ চেতনার উপস্থিতি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বিচার্য। এই প্রক্রিয়াটি সময় ও স্থানের উর্ধে। অর্থাৎ যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে তা পরিলক্ষিত। পঞ্চাদশ শতাব্দীর ইউরোপ, উনবিংশ শতাব্দীর জাপান, হালের ইরান যেন একই সূত্রে গ্রথিত। ইতিহাস রচনার তাগিদে সমৃদ্ধ তারা এই সময়গুলোতে, ভিন্ন ধারায়। উপলব্ধি, মনন ও অস্তিত্বকে আরও সুষ্ঠ রূপ দেয়ার ইচ্ছা এই সংগ্রামের নির্যাস। কিন্তু সে সংগ্রাম পূর্ণাঙ্গ কোন প্রক্রিয়া নয়।

বাংলাদেশ যখন পাকিস্তান ছিল, উপনিবেশিক শক্তি আঘাত হানল মাতৃভাষার ওপর ষড়যন্ত্র আঁটল বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সুস্পষ্ট পরিচয়কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নেপথ্যে নিয়ে যাওয়ার। স্বভাবতই সোচ্চার হোল জনতা, তবে সে সংগ্রামের শ্রেণীরূপটি মুখ্য হয়ে উঠল না। একুশের সেই বিদ্রোহ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাল।

কিন্তু এখন তো বাংলাদেশ। জাতীয় অস্তিত্ব, জাতীয় সত্তার ব্যাখ্যা এখন তো আর শ্রেণীনিরপেক্ষভাবে হতে পারে না। ১৯৫২ বা পরবর্তী বছরগুলোতে কাদের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন ছিল আর এখন কাদের এই প্রশ্নের উত্তর বলে দেবে একুশের মূল্যায়ন কিভাবে করতে হবে। জাতীয় সত্তার বিকাশ যদি '৭১-এর সংগ্রামে হয়ে থাকে, তবে তা আংশিক, যা অসুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু প্রক্রিয়াটির পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহের সম্ভাবনাও যেন ক্ষীণ। তাই একুশের চেতনা কি ব্যর্থ হয়ে গেছে, এই প্রশ্নটির উত্তর দ্বৈতরূপ পরিগ্রহ করবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি যে শ্রেণীটির পরিচায়ক তারা একুশকে ফুল দিয়ে, সঙ্গীত দিয়ে বরণ করবে। উচ্চকণ্ঠে প্রচার করবে একুশ তাদের ধমনীর আবীর স্রোত। ব্যর্থতার

প্রসঙ্গটি বড়ই অহেতুক তাদের কাছে, যেন গলিত লাশ নিয়ে ঘাটাঘাটি, কিন্তু দৈন্যতার ধারক শ্রেণীটির কথা যদি উঠে আসে ও সেই প্রেক্ষিতে একুশের বিদ্রোহের সুরটির মূল্যায়ণ করা হয়, সে চেতনা ব্যর্থ হয়ে গেছে বৈকি। গ্রামের কিশোরটি সাতসকালে যখন গৃহপালিত পশুর অভিভাবক হয়ে বেরিয়ে পড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে। মাতৃভাষা কি গর্বিত হয় তার কণ্ঠে লালিত হতে? কিশোরটি যখন জানে না সে বাঙালী, তখনকি আত্মপরিচয়ের কোন দাবীর যৌক্তিকতা আছে আমাদের? কিন্তু এই-ই যেন রোজনামচা, সীমাহীন শোষণের নৈমিত্তিক সাক্ষীও। তাহলে একুশের মত করে কোন বিদ্রোহ কেন আসে না, হাজারো কণ্ঠ তেজোদ্দীপ্ত হয়ে সোচ্চার হয় না এই শোষণ, এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে? সেই তো ইতিহাস যার পাতায় '৫২'র একুশ ধূসর কোন স্মৃতি, পরাজিত কোন সৈনিকের মত বলতে হয় আমরা বিদ্রোহ জানি না।

আমরা লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারিনি / আফতাব আহমদ

পঞ্চান্নোর পর যাদের জন্ম, তাদের কাছে একাত্তর এক আবেগ, উনসত্তর এক স্মৃতি আর বায়ান্নো এক জনশ্রুতি। ভাষা আন্দোলনে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের তো প্রশ্নই ওঠেনা, পরোক্ষভাবে তারা শুধুমাত্র পরবর্তী গণআন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামকেই প্রত্যক্ষ করেছে। বায়ান্নো তাই তাদের কাছে এসেছে বহু হাত ঘুরে, খণ্ডিত অনুভবে।

তবুও একুশ আমাদের কাছে প্রতীক, একটি শপথ। যেহেতু ভাষার দাবী সার্বিক মুক্তির দাবীরই একটি অংশ, তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সঙ্কীর্ণ অর্থে একুশের আন্দোলনেরই এক যৌক্তিক সাফল্য। বৃহত্তর অর্থে একুশ হচ্ছে জনগণের সার্বিক মুক্তিরই প্রতীক।

স্বাধীনতার দশ বছর পর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারিনি; এমনকি বেশীদূর এগুতেও পারিনি। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'নতুনতর পরিস্থিতির' উদ্ভব যদি ঠিক এই মুহূর্তে না হত তাহলে কথাটি সত্যতা হারাবে না। কিন্তু এ পরিস্থিতির যে সৃষ্টি হয়েছে সেটা অনস্বীকার্য। এবং তার ফলেই প্রেক্ষিত গেছে বদলে।

আমরা, অর্থাৎ বায়ান্নো পরবর্তী তরুণেরা, যদি একুশকে শুধু একটি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে নেই তাহলে আর ব্যর্থতার প্রশ্ন আসে না। সাফল্যেরও না। কিন্তু ঐ সত্য যদি আমাদের কাছে বহুমাত্রিক হয়ে ধরা দেয় তাহলে অতীতের ব্যর্থতার কথা আমাদের ভুলতে হবে। কেননা অতীতের ইতিহাস, কেবল স্বাধীনতা লাভ ব্যতীত ব্যর্থতার। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়া যায়, কিন্তু তাকে দুঃস্বপ্ন হতে দেয়া যায় না।

ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই আমাদেরকে ভেবে নিতে হবে আমরা কার দলে, গরিষ্ঠের না লঘিষ্ঠের। এ ভাবনা চিন্তায় অতীত শুধু উদাহরণের দায়িত্ব পালন করবে। হাহুতাশের নয়।

একুশ তো ময়ূরপঙখীতে সওয়ার রাজপুত্রের জীয়নকাঠি নয়, একুশ তো অস্তিত্ব। আমি আশাবাদী।

নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা একুশকে সার্থক করবে

এ, কে, এম, হারুনার রশীদ

ভাষাআন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আমাদের সামনে এসেছিলো একুশে ফেব্রুয়ারী। একুশ এসেছিলো এমন এক চেতনার প্রতীক হিসেবে, যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী জাতির স্বকীয়তা অর্জিত হবে, যে চেতনা সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনকে নবতর ব্যঞ্জনায় জাগ্রত করে তুলবে। একুশের চেতনার প্রত্যাশা হচ্ছে একদিকে বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার তথা বাংলাভাষাকে সত্যিকারের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা, আর একদিকে স্বাধীন-সমাজতান্ত্রিক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু একুশের চেতনার সে প্রত্যাশা আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারী আজ নিছক একটা সাংবাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর একুশ আসে আমাদের সামনে। আর আমরা নেহায়েৎ আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে সেমিনার ইত্যাদির আয়োজনের মাধ্যমে বক্তৃতা আর কথামালার ফুলঝুড়িতে একুশের উৎসবটাকে একটু গরম করে তুলি। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। একুশ তখন যে ভাবমূর্তি নিয়ে এসেছিল আজ আর তা নেই। স্বৈরাচারী শক্তির উত্থান, সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির সঠিক তথা ইতিবাচক রাজনৈতিক কর্মসূচী ও তার ভিত্তিতে আন্দোলনের ব্যর্থতা ইত্যাদি একুশের চেতনা ও ভাবমূর্তিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। একুশের চেতনার মাঝে লুক্কায়িত ছিল আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু সে প্রত্যাশা আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই আজকের ঘুণে ধরা, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই একুশ সার্থক হয়ে উঠবে।

উন্নয়নের ধারনায় বিভ্রান্তি / আলী রীয়াজ

আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলোর মাহাত্ম্যে একথা প্রায় সত্য বলে মনে হয় যে, দেশ শনৈঃ শনৈঃ গতিতে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। গত কয়েক বছর লক্ষ কোটি বার আমরা উন্নয়নের এই জয়ডঙ্কা শুনতে পেয়েছি। স্বাধীনতার পর থেকে যে হারে উন্নয়নের কথা আমাদেরকে শোনানো হয়েছে সে হারে উন্নয়নের ধারা যদি ৮ কোটি জনগণ অধ্যুষিত ৫৪ হাজার বর্গ মাইলের এই ছোট্ট ভূখণ্ডে প্রবাহিত হতো, তবে বোধকরি আমাদেরকে আর 'উন্নয়নশীল' দেশ বলে অভিহিত না করে উন্নত, নিদেনপক্ষে প্রায় উন্নত দেশ বলেই অভিহিত করা যেতো। 'উন্নয়ন' শব্দটি আমাদের কাছে এতো বেশী পরিচিত হয়ে উঠেছে আর তার ঢক্কা নিনাদ আমাদের কর্ণ-কুহরে এতো বেশী প্রবিষ্ট হয়েছে যে, এখন তা আর আমাদের কাছে কোনো বিশেষ অর্থ বহন করে না। স্বাধীনতার পর আমাদের প্রত্যাশা ছিলো আমাদের এতো দিনের 'অনুন্নত' অবস্থার অবসান ঘটবে এবং আমরা উন্নয়নের চেহারা দেখতে পাবো। সেই প্রত্যাশা বোধকরি তৎকালীন সরকারেরও ছিলো; কিন্তু বাস্তব অবস্থায় তার সম্ভাবনা কতটুকু ছিলো বা কতটুকু সম্ভব ছিলো তা না ভেবেই এই হারে উন্নয়নের ঢক্কা-নিনাদ পেটানো শুরু হলো যে এই দেশ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে অতি সহজেই। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই বোঝা গেলো এ নেহাৎই কথার কথা, ফাঁকা বুলি। তার পরে যে সরকারই এসেছে একই হারে এই শব্দের প্রতিধ্বনি তুলেছে। '৭৫ সালের পরিবর্তনের পর ক্ষমতাসীন হয়ে বর্তমান সরকার 'উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের' প্রদর্শনী শুরু করেছেন। 'স্বেচ্ছাশ্রম' 'স্বনির্ভরতা', 'খালকাটা প্রকল্প' ইত্যাকার বহুবিধ কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে ঘটা করে উপস্থাপন করা হয়েছে---যেনো এ সবই উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক। সরকার এ সব কিছুকে তার প্রচার যন্ত্রসমূহের

মাধ্যমে উন্নয়নের মহোৎসবের মতো করে একটা হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছেন।

এ সব কর্মকাণ্ড, জনগণকে বোঝানো হচ্ছে এই ভাবে যে, এগুলোই হচ্ছে একটি দেশের উন্নয়ন। কিন্তু 'উন্নয়নের' শেষ লক্ষ্যটি কি তা' কখনোই বলতে পারেননি তাঁরা। এর কারণ কি? উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণের বহু দিনের সুপ্ত আকাঙ্খার বাস্তবায়নের দূরূহ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েও বর্তমান সরকার জনগণকে বলতে পারছেন না উন্নয়নের এই গতি শেষাবধি তাঁদেরকে কোন স্বর্ণশিখরে নিয়ে যাবে। এর কারণ একটাই--উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণকে প্রকৃতপক্ষে অবহিত করতে ''উন্নয়নবিদরা'' উৎসাহী নন। উন্নয়নের যে ধারণা তাঁরা জনগণের ভেতরে প্রচার করছেন তাতে যে জনগণের আদৌ উন্নয়ন সম্ভব নয়--এটি তাঁরা ভালো করেই জানেন। আর এটাও জানেন যে, উন্নয়নের যে ধারণা আজকে তাঁরা দিচ্ছেন তা প্রকৃতপ্রস্তাবে উন্নয়নেরই ধারণা নয়। উন্নয়ন বলতে আজকে সাধারণ অর্থে যা বোঝানো হচ্ছে তা হলো শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশ। উন্নয়ন বলতে পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা আমাদেরকে যে ধারণা উপহার দিয়েছেন তা হলো অর্থনৈতিক বিকাশের ধারণা। তাঁদের মতে 'যদি কোন একটি দেশ বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়ে (বার্ষিক মাথাপিছু ৫০০ ডলার) আত্মনির্ভরশীলভাবে শতকরা ৫ ভাগ বা ৭ ভাগ হারে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখে তাহলে সে দেশকে উন্নত দেশ বলে ধরে নেয়া হবে।' উথান্ট এই ধারণাকে যৎসামান্য পরিবর্তন করে আরেকটি বক্তব্য রেখেছেন; তাঁর মতে উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তনের সমন্বয়। কিন্তু বিকাশের সূত্র কি বা পরিবর্তনের লক্ষ্য কি হবে? তা এখানে অনুক্ত রয়েছে। এই ধরণের ধারণায় কোনো স্পষ্ট অবয়ব পরিলক্ষিত হয় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা যে সার্বিক উন্নয়নের ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তা তো বলাই বাহুল্য। পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণায় যেমন অস্পষ্টতা ও স্থিতিস্থাপকতা তৈরী করেছেন তেমনি পশ্চিমের সমাজতত্ত্ববিদদের উন্নয়নের ধারণাও কুহেলিকাচ্ছন্ন। উন্নয়ন, আধুনিকতা ও আধুনিকায়ন তাঁদের কাছে একার্থবোধক বলে প্রতিমীত হয়েছে। সে ধারণা

ব্যক্ত করে ফস্টার বলেছেন উন্নয়ন হচ্ছে "বস্তুগত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির ভঙ্গি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আচরণের পরিবর্তন।"[১] এই যে অস্পষ্টতা পশ্চিমের পৃথিবীতে তৈরী করা হয়েছে তার লক্ষ্য অনেকাংশেই আমাদের মতো স্বল্পোন্নত তৃতীয় ভুবনের মানুষেরা। আর সেই সুযোগটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছেন আমাদের সরকার। আমাদের দেশ তাঁদের মাহাত্ম্যে রাতারাতি উন্নয়নের স্বর্ণসোপান স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে বলে তাদের জোর গলার দাবী। তাঁদের কল্যাণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটছে কিনা তা বিতর্কিত বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রও তার আলাদা। আমার আলোচ্য বিষয় উন্নয়নের এই বাক্যজাল বিস্তার করে উন্নয়ন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াসটি। যে বিপুল জনগোষ্ঠী প্রতিদিন কর্মক্লান্ত হয়েও একটা উন্নয়ন-প্রত্যাশী মন নিয়ে আকাঙ্খার স্বপ্নজাল বুনে চলেছেন তাঁদেরকে যদি উন্নয়ন সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণায় দীক্ষিত করে না তোলা যায় তবে বিভ্রান্ত-ধারণার কুহকী মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে অতীতের মতো ভবিষ্যতেও তাঁরা অন্তহীন আবর্তে ঘুরপাক খাবে, মুক্তির কোনো দিক দিশা খুঁজে পাবেনা।

উন্নয়ন বলতে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশের ধারণার বাইরে যে প্রকৃত ধারণাটি অবস্থান করে তা হলো মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা। বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন নয়, গুণগত উৎকর্ষ সাধনই একটি জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি। আর তাই আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশের জন্যে উন্নয়নের প্রধান ও প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণকারী ও নিয়ন্ত্রিত, সুবিধাভোগী শ্রেণী ও বিপুল জনগণের সম্পর্কের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন যদি সমাজ ব্যবস্থায় শোষণমূলক সম্পর্কের অবসান ঘটাতে পারে তবেই উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে, অন্যথায় নয়। সাধারণ ভাষায় এই ধারণা ব্যক্ত করে অনেকে বলেন, "সমাজের সকল গোষ্ঠী ও ব্যক্তির গুণগত উৎকর্ষ সাধনই উন্নয়ন।"[২]

---

১. Traditional Cultures and the Impact of Technological Change : G. M. Foster.

২. গ্রাম বাংলার উন্নয়নঃ তৃতীয় মত।। মাহবুবউল্লাহ বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা ১৯৭৬ পৃঃ ২৪

অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই বক্তব্যকে উন্নয়নের সাধারণ ধারণায় স্থানান্তরিত করলে তা আরো সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। সে কথা ব্যক্ত করা যায় এই ভাবে "উন্নয়ন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি সমাজ তার পরিবেশ ও তার রাজনৈতিক লক্ষ্যের ওপরে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে এবং তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।"[৩] উন্নয়ন সম্পর্কিত দুটি ধারণার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য খুব সহজেই চোখে পড়ছে যে, একটি ধারণা উন্নয়নকে একটি স্থিরীকৃত বিষয় বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছে আর অন্যদিকে দ্বিতীয় ধারণা বলছে এটি একটি প্রক্রিয়া। যে কোনো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই আমরা জানি যে, তার শেষ নেই, তা সদা প্রবহমান।

এই পার্থক্যটির কথা এখানে উল্লেখ করবার কারণ একটিই। তা হলো এই যে, একটি ধারণা অগ্রগতিকে একটি স্তরে এসে স্থবির জঙ্গম ধারণায় পরিবর্তিত করছে চাইছে আর অন্যদিকে অপরটি চাইছে তা সব সময়ই চলিষ্ণু থেকে বিপুল জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাক। এগিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে---এ প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত। আর তা উঠুক দ্বিতীয় ধারণাটির প্রবক্তারা তাই আশা করেন। আমি আলোচনার গোড়াতেই বলেছিলাম আমাদের উন্নয়নবিদরা বলতে চান না আমাদের উন্নয়ন-যাত্রার শেষ কোথায়। তাঁদের এই দুর্বলতার কারণ তাঁরা নিজেরা নন। তাঁরা যে তত্ত্ব-অনুসারী তাদের সেই তত্ত্বেরই দুর্বলতা এটি। কিন্তু দ্বিতীয় ধারণার প্রবক্তারা বলেন যে, এই উন্নয়ন-যাত্রা আমাদেরকে মুক্তির দ্বারে পৌছে দেবে। 'মুক্তি' এই শব্দটি ও প্রসঙ্গটি এখানে অত্যন্ত সচেতনভাবেই তোলা হয়েছে। কেননা দ্বিতীয় ধারণার প্রবক্তারা যা চান তা হলো উন্নয়নকে একটি মানবীয় প্রকল্প হিসেবে উপস্থাপন করতে। যে সাধারণ ধারণাটি আজকে প্রচলিত আছে তার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আছে বস্তুগত শক্তির বিকাশের প্রশ্নটি। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন তথা বস্তুগত শক্তির বিকাশকে বড় করে দেখা হয় বলেই শিল্পায়নের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে ভাবনা-ধারা প্রচলিত হলে বস্তুই যেখানে মূল্যহীন হয়ে যায়

---

[৩] Toward a Non-Western Model of Development : Inayatullah Communication and change in Developing countries. pp. 91

সেখানে মানবিক ও সামাজিক সৃজনশীলতার প্রশ্নটি অত্যন্ত বেশী মাত্রায় গুরুত্ব দাবী করে। মানবীয় বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিত থেকে উন্নয়নের ধারণাকে বিবেচনা করবার এই প্রক্রিয়াটি শেষ লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে দেয় মুক্তিকে। এই মুক্তি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ও বটে। মুক্তির এই ধারণা ব্যক্ত করে অর্থনীতিবিদরা বলছেন ‘‘এই মুক্তির লক্ষ্য হলো মানুষকে প্রকৃতির দাসত্ব, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, নিপীড়নমূলক প্রযুক্তি, বিজ্ঞানমূলক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, অন্যায় শ্রেণী কাঠামো, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা---এক কথায় সকল প্রকার অমানবিক সংস্থার কবল থেকে মুক্ত করা।’’[৪] মুক্তির এই ধারণাটি যখন অর্থনৈতিকভাবে উদ্ভুত হয় ঠিক তখনি তার সহযোগী হিশেবে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো আসে। আর তাই অর্থনৈতিক মুক্তির ধারণার সাথে আসে রাজনৈতিক বন্ধনহীনতার প্রশ্ন। সেখানে যেতে আমরা অনুৎসাহী, অপরাগও বৈকি---আমাদের উন্নয়নের সরকারী ক্রীড়া-কৌতুক তাই প্রমাণ করে। এই নিয়ে আমরা ভাবিত না হয়ে উন্নয়নের জয়---ডঙ্কা বাজিয়েই চলি আর বিপরীত দিকে আগ্রাসী দারিদ্র তার মুখে পুরে নেয় সামনে যা কিছু পায়। মূল্য-সূচক লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে---পাঁচশ সাড়ে পাঁচশর মাত্রা ছাড়াতে তার বেশী দিন ব্যয় হয় না।

আমাদের দেশে উন্নয়নের ধারণায় যে পশ্চিমী রীতিটি প্রবিষ্ট হয়েছে এবং ভিত্ গেড়ে বসেছে তা আমাদের চারপাশে তাকালেই বোঝা যায়। কিন্তু এর কারণটি কি সেটি সত্যি অনুসন্ধানযোগ্য বিষয়। যে ধারণা আমাদেরকে আপাতঃ মোহমুগ্ধ করে রাখে কিন্তু শেষাবধি একটি অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কিছুই উপহার দেয় না তা এতো দৌর্দণ্ড প্রতাপে কেন বহাল আছে তা দেখতে পেলে দেখতে হবে আমাদের দেশে উন্নয়নের ধারণাটি এসেছে কিভাবে। আমাদের দেশে উন্নয়নের ধারণাটি এসেছে আমাদের দেশের শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর মধ্য দিয়ে। এই ধারণায় রংচং তাঁদেরকেই সর্বাগ্রে মোহিত করেছে। এরা যে এতো সহজে মুগ্ধ হয়েছেন এটা অত্যন্ত স্বভাবিক, তৃতীয় ভুবনের অন্যান্য দেশেও এদের সহযাত্রীর ভূমিকাও একই।

---

৪. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৫

কেননা একটি দেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে যে ধারণা জনগণকে দিয়ে আসছিলেন তাতে মনে হচ্ছিলো বাহ্যিক উপনিবেশ-মুক্ত হলেই দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইতে থাকবে। কিন্তু এ হচ্ছে একটি দেশের জনগণের সামনে ইতিহাসের রোমাণ্টিক ব্যাখ্যা প্রদান। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে এই ধরণের রোমাণ্টিকতা যৎসামান্য কাজে দিলেও সার্বিক মুক্তির পক্ষে তা বাধা হয়েই দাঁড়ায়। এসব এলিটরা এই ধারণায় জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিলেন যে, তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত। তাঁরা একথা জনগণের সামনে কখনোই আসতে দেন নি যে, জনগণের সার্বিক মুক্তির পথে জাতীয় স্বাধীনতা হচ্ছে একটি পদক্ষেপ এবং তা শুধুমাত্রই প্রথম পদক্ষেপ। উপনিবেশ-মুক্ত হবার পর তৃতীয় ভুবনের অনেক দেশই আবিষ্কার করলো যে, তাঁদের এলিটরা তাঁদেরকে যে ধারণা দিয়েছেন তা ভুল। তখন এই ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্যেই উন্নয়নের নতুন তত্ব এই সব এলিটরা জনগণের সামনে নিয়ে আসতে থাকেন। তাঁরা বলতে থাকেন আমাদের উন্নয়নের জন্যে দরকার শিল্পায়ন ও আধুনিকায়ন, দরকার নগরায়ন। তাঁরা মূল্যবোধের ঐতিহ্যগত ধারণাগুলো বাতিল করে দিতে থাকেন। তাদের বড় যুক্তি ছিলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। বস্তুগত শক্তির বিকাশের ওপর তারা গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন এবং পুরোনো সমস্ত ধ্যান-ধারণাগুলো, এমনকি বস্তুগত শক্তির বিকাশের পরিবর্তে মানবীয় ও সামাজিক সৃজনশীলতার সুপ্ত শক্তির বিকাশের ধারণাটিও, সংকীর্ণ ও Traditional ধারণা বলে প্রত্যাখান করতে থাকেন। তার ফলে ঐতিহ্য থেকে, এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের সাংস্কৃতিক-প্রবহমানতা থেকেও, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদেরকে ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কারণ হচ্ছে এসব এলিটরা উন্নয়ন, আধুনিকতা ও আধুনিকায়নের নামে যে ধারণাটি জনগণের সামনে নিয়ে আসছিলেন তা আসলে ছিলো পশ্চিমায়নের ধারণা। সামাজিক পরিবর্তন ও বৃদ্ধির যে রীতি এসব দেশে প্রচলিত ছিলো তার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে না পারলে উৎকেন্দ্রিক এই পশ্চিমায়নের ধারণাটিতে জনগণকে শরীক করা যাবেনা।

আর তা ছাড়া যে সব এলিটরা (রাজনৈতিক ও বুরোক্রেটিক) এই উৎকেন্দ্রিকতার সপক্ষে দাঁতে দাঁত রেখে নেমে পরেছিলেন তাঁরা এমনিতেই

ছিলেন্ আপন ঐতিহ্য বিচ্যুত। উপনিবেশিক শক্তির সাথে সহযোগিতা করতে গিয়ে তাঁদেরকে বাধ্য হয়ে হতে হয়েছিলো পশ্চিমায়িত। পরবর্তী সময়ে এইসব প্রভুদের অনুপস্থিতিতে আপন অবস্থানটি টিকিয়ে রাখতে এই সব এলিটরা আধুনিকায়ন তথা পশ্চিমায়নের শ্লোগান তুলে ছিলেন। এইভাবেই ''সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের'' খপ্পরে পরেছে তৃতীয় ভুবনের দেশগুলো।

এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রথম কাজই হচ্ছে মূল্যবোধের পরিবর্তন ---যে পরিবর্তন দেশের মুখ ঘুরিয়ে দেবে পশ্চিমের দিকে। উন্নয়নশীল দেশের সমাজকে প্রথমেই তারা শনাক্ত করেছে অনুৎপাদনশীল, বন্ধ্যা ও নিবীর্য বলে। কেননা এদের প্রযুক্তিগত কাজের সীমা সীমিত, নগরায়ন হয়নি মোটেই। এই সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে অনুকরণ; বস্তুগত শক্তির বিকাশ হয়নি তোমাদের, অতএব পশ্চিমের অনুসরণ কর। সৃজনশীলতার যে সুপ্ত সম্ভাবনাটি আছে তাকে নস্যাৎ করে দেবার জন্যে বোঝানো হয়েছে যে, পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-কারিগরী শিক্ষা সবটাই অনুকরণীয়। এসব দেশের শিক্ষার মডেলটিও ঠিক এইভাবেই গড়া হয়েছে। শিক্ষিত এলিটরা কি জেনে কি না জেনে এইভাবেই বিভ্রান্ত হয়েছেন ও হচ্ছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে তৃতীয় ভুবনের জন্যে এই যে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী ফাঁদ পাতা হয়েছে তাতে আমরাও পা দিয়েছি। আর আমাদের এলিটরা উন্নয়নের ধারণাটি সংগ্রহ করেছেন ঐভাবে। অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে সচেতন নির্বাচনে এই ধারণা সংগৃহীত হয়নি, হয়েছে অন্ধ অনুকরণে।

অন্ধ অনুকরণের একটা বড় দোষ হচ্ছে যে, তা বিচারবুদ্ধির লোপ ঘটায়। বিপরীতক্রমে এইটিই শত্রুর সবচেয়ে বড় সুবিধে। তৃতীয় ভুবনের দেশগুলোতে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ যখন তার বিজয়ের সূচনা করেছে ততদিনে পশ্চিমা দেশগুলো 'অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ভিত্‌টি পাকা করে ফেলেছে। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পরে আমরা যখন পশ্চিমের দিকে এগিয়েছি তখনি আমাদের হাতে পায়ে শৃংখল দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিলো পশ্চিমের দু'টো অর্থনৈতিক অস্ত্র---(এক) তুলনামূলক ব্যয় সুবিধাবিধি বা অবাধ বাণিজ্য (দুই) ঋণ, সাহায্য ও কারিগরী সহযোগিতা---এক কথায় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ।

প্রথম জালটি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোর বাণিজ্য বিস্তারে। বাণিজ্যের এই ধারণাটি প্রথমে আসে শ্রম বিভাজন ও বাজার সম্প্রসারণের প্রয়োজন থেকে। শ্রম বিভাজনের প্রসঙ্গটি প্রথম উত্থাপন করেন এ্যাডাম স্মীথ। Wealth of Nation গ্রন্থে (প্রকাশকাল ১৭৭৬) স্মীথ শ্রমের বিভাজনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন দুটো দিক বিবেচনা করে। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে শ্রম-শক্তির বিশেষীকরণের (specialization) জন্যে। এই কাজের অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যা ঘটবে তা হলো “greatest improvment in the productive powers of labour, and the greater part of the skill, dexterity, and judgement with which it is any where directed or applied. ’৫ কিন্তু দেখা গেলো যে এটি সম্ভব এমনি একটি সমাজে যেখানে বিনিময়ের জন্যে উৎপাদন সম্ভব। স্মীথ এই অবস্থার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বাজার সম্প্রসারণের (Extent of market. ৬) কথা বল্লেন।

বাজার সম্প্রসারণের এই তত্ত্ব থেকেই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের গোড়াপত্তন। স্মীথ কথিত এই Extent of Market-এর বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় ডেভিড রিকার্ডোর Principles of Political Economy & Taxation গ্রন্থে (প্রকাশকাল ১৮১৭)। এইখানেই তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা বিধির তত্ত্বটি উপস্থাপিত হয়। রিকার্ডো দেখালেন বাজার সম্প্রসারণের জন্যে আভ্যন্তরীণ সীমিত বাজারের গণ্ডী পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক বাজার কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। তিনি তাঁর তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা বিধি ব্যাখ্যা করে বললেন যে, একটি দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য যখন অন্য দেশেই উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের চেয়ে কম হবে তখন সে অধিকতর উৎপাদনের মাধ্যমে তা বিক্রী করে মুনাফা লাভ করবে এবং বিপরীতক্রমে ঐ দেশ তার উৎপাদিত সহজলভ্য বিক্রীর মাধ্যমে মুনাফা লাভ করবে। এই তত্ত্ব তাত্ত্বিক দিক থেকে উভয় দেশের জন্যে লাভজনক হলেও বাস্তবতঃ দেখা গেলো যে, শিল্প-বিল্পবোত্তর

---

৫. The Wealth of the Nation : Adam Smith. Edwin Canan, ed. I. pp. 7

৬. পূর্বোক্ত pp. 21

ইংল্যাণ্ডের উৎপাদিত দ্রব্য যখন সে বিক্রীর জন্যে নিয়ে এলো আমাদের মতো উপনিবেশগুলোতে তখন আমাদের দেবার মতো আছে কেবল কাঁচামাল। আবার কখনোবা বহির্বাণিজ্যে বিনিময় মূল্যানুপাত কমিয়ে এনে সে স্থানীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে বাজার দখল করে নেয়। বাজার দখল হয়ে গেলে মূল্যবৃদ্ধি করে শুষে নিতে থাকলো আমাদের শেষ শোণিতটুকু। এই অবস্থাটা এমন শক্ত ভিত্ গেড়ে বসলো যে, যখন উপনিবেশের জোয়াল কাঁধ থেকে নামাতে সক্ষম হই তখনও দেখি উৎপাদন সম্পর্ক আর উৎপাদন ব্যবস্থা তাদেরই দখলে। আমাদের শ্রমের প্রাচুর্য আমাদেরকে দিয়ে হালকা শিল্প প্রতিষ্ঠা করছে আর তাই নিয়ে অবাধ বাণিজ্যের নীতিতে টক্কর দিতে যাচ্ছি শিল্পোন্নত পশ্চিমের সাথে। অথচ দামী যন্ত্রপাতি আর প্রয়োজনীয় পণ্য কিনছি উচ্চমূল্যে ঐ পশ্চিম থেকেই। ফলে আমরা ঠকছি দু'ভাবে—এক, আমাদের উৎপাদিত দ্রব্যের কম মূল্যে। দুই, তাঁদের কাছ থেকে ক্রীত দ্রব্যের অধিক মূল্যে।[৭] এই ভাগ্য কম-বেশী তৃতীয় ভুবনের স্বল্পোন্নত প্রায় প্রতিটি দেশেরই। তাঁদের উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের এই চেপে বসা জোয়াল তাঁরা কোনোভাবেই লাগাতে পারছে না। সেক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাকে উপনিবেশিক শক্তির করতলে রেখে যখনই উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে তখন তার চরিত্রটি নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে ঐ পশ্চিমী মডেলেই। কেননা মানবীয় সৃজনশীলতার পথ রুদ্ধ করবার জন্যেই এই মডেলটি তৈরী করা হচ্ছে।

সেখানে এই উন্নয়নের প্রশ্নটি তোলার আগে যা দরকার তা হলো উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন। কিন্তু এই দিকটি নজরে না রেখে কিংবা জনগণের চোখের আড়ালে রাখবার জন্যেই আজকের দিনে আমাদের দেশে উন্নয়নের শ্লোগান তোলা হচ্ছে। অবাধ বাণিজ্যের অর্থনীতি আর সম্পদ স্থানান্তরের এই সহজ রাস্তাটি খোলা রেখে যতই উন্নয়নের বাক্যজাল বিস্তার করি না কেন তা হবে তলাহীন পাত্রে জল ঢেলে তা পূর্ণ করবার আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র।

৭। এ বিষয়ে অধিকতর পাঠের জন্য:-
অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ স্বনির্ভরতা ও বাংলাদেশ: সনৎকুমার সাহা অর্থনীতি প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা পৃঃ ৬৩ (পুনর্মুদ্রিত রচনা)।

অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের এই প্রথম জালটি আপাতঃদৃষ্টে খুব স্পষ্ট মনে হলেও আসলে তা নয়। খুব সূক্ষ তত্ত্ব দিয়ে তৈরী এই জাল এতো বেশী বিস্তৃত হয়ে আমাদের মতো ছোট ছোট দেশগুলোকে গেঁথে ফেলেছে যে তা থেকে ছুটতে গেলে ক্রমেই তা চেপে বসতে থাকে। এই জাল ভেদ করার জন্যে তৎপর তৃতীয় ভুবনের দেশগুলোর সামনে একমাত্র পথ হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কে একটি আমূল পরিবর্তন আনা। এই পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার গোড়াতেও বলেছি—শোষণমূলক সম্পর্কের অবসান। সেই জন্যে পথ খোলা থাকে দু'টি। পথ যেমন খোলা থাকে দু'টি তেমনি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় জাল---সাহায্য ও কারিগরী সহযোগিতা---সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে কখন কিভাবে আমরা তাদের হাতের মুঠোয় যাবো।

সে বিষয়ে আলোচনা করবার আগে আমাদের দেশে এই দুই সাম্রাজ্যবাদী---(সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ)---শক্তির কার্যপরিধি বিস্তারের ইতিহাসটি একটু খতিয়ে দেখা যাক। বৃটিশ উপনিবেশ ভারতে বৃটিশরা অবাধ বাণিজ্যের তত্ত্ব হাজির করে যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো তা আমাদের স্থানীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে দিয়ে তাদের পাকচক্রে বেঁধে ফেলেছিলো খুব সহজেই। স্থানীয় বাজারে কম মূল্যের শ্রম দিয়ে উৎপাদিত বস্ত্র শিল্পকেও তারা দখল করে নিয়েছিলো বিনিময় মূল্যানুপাত কমিয়ে এনে। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের করতলগত ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দেশ বিভাগের নাটকটি সংঘটিত হয়। এই ঘটনার পর হাজির হয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বটি। ভারতের বিভক্ত উভয় দেশই এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদতলে মাথা পেতে দেয়। আর এরই ফলে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তি-ভিত্ গেড়ে বসে প্রথম সূত্রে। এবং খানিকটা পরে সারা বিশ্বে দ্বিতীয় সূত্রের জালটি পাতা হতে থাকে। আমরাও তা থেকে বাদ যাইনা। কারিগরী সহযোগিতার প্রসারিত হস্তে আমরা নির্বিবাদে, নিঃসঙ্কোচে, নিশ্চিত নিরাপত্তার কথা ভেবে হাত রাখি। তারপর আসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সাহায্যের ঢল নামে---আমরা সপ্রশংস কৃতজ্ঞতায় তা লুফে নেই এবং অজান্তে নিজেদের জড়াই আরেক সূত্রে। এই ইতিহাসটি এখানে স্মরণ করা হলো

একটি কারণে তা হলো যখনই আমরা উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের সম্ভাব্য দু'টি পথ বিবেচনা করবো তখনই দেখতে পাবো সেটিকে বাধা দেবার জন্যে আরেকটি সূত্র সেখানে তৈরী করা রয়েছে। সেটি হলো কারিগরী সহযোগিতার মুখোশ আবৃত সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র।

উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের জন্যে আমাদের সামনে যে দুটি পথ খোলা আছে তা হলো—এক, উৎপাদন ব্যবস্থাকে সরল করে তোলার লক্ষ্যে জটিল ও উন্নত কলকারখানার অবলুপ্তি। দুই, ঐ কলকারখানার জটিল যন্ত্রপাতি নিজেদের উৎপাদন। প্রথমটি যদি বেছে নেই তবে আমাদেরকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে কুটির শিল্পে বা কৃষিতে। দ্বিতীয় পথটি বেছে নিলে তার সহজ সমাধান হচ্ছে লাগসই টেকনোলজি। প্রথমটির একটি প্রধান অসুবিধে হচ্ছে যে, তা 'উৎপাদন ব্যবস্থাকে অতি নীচু স্তরের স্থিতিবস্থায় আটকে দেয়।'[৮] আর যদি কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপের কথা ভাবি তবে প্রথমেই আসবে ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন। উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা না বলেও গ্রামোন্নোয়নের মায়াকান্না আমরা বিগত কয়েক বছর বেশ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তা যে নেহাৎই মায়াকান্না তা বুঝতে পারি কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই।

এটা ঠিক যে, আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশের একটা বড় পরিধি হচ্ছে গ্রাম; জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশটির বাসও এই গ্রামে। কিন্তু এই গ্রামেই উন্নয়নের কর্মকাণ্ড পৌঁছে দেয়া যাচ্ছে না তা এমনকি পশ্চিমা উন্নয়নবিদদেরও বক্তব্য। ম্যাকনামারা ১৯৭৩ সালে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাংকের বার্ষিক সভায় প্রদত্ত রিপোর্টেও একথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা গ্রামোন্নয়নের যে সূত্র উপস্থাপন করছেন তাতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে প্রশাসনিক উদ্যোগে। সেখানে বিশ্ব ব্যাংক বা আইএলও'র সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। এই সাহায্য-সহযোগিতার কথা পরে আলোচনা করবো। তা ছাড়াও প্রশাসনিক উদ্যোগের যে পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে তা উন্নয়নমুখী ও উৎপাদনমুখী কর্মের উদাহরণ হতে পারে না। এই আঙ্গিকেই ইদানিংকালে আমাদের দেশে গ্রামোন্নয়নের

---

[৮] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮

প্রয়াস পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সফল গ্রামোন্নয়নের প্রত্যাশা মরিচীকা মাত্র। সেখানে ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। এই অবস্থা ব্যাখ্যা করে পরিকল্পনাবিদরা যা বলছেন তা এখানে প্রনিধানযোগ্য ঃ

"প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সফল গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর একটা হুমকির মতো অবস্থান করছে। এই হুমকি আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। বিশেষ করে কর্তৃপক্ষের বর্তমান মন্ত্রণালয় ধারা থেকে।

ব্যাপক ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন পুরো উন্নয়ন কর্মসূচীকেই অন্তর্ভুক্ত করবে বা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সে জন্যে এটি প্রায় সকল মন্ত্রণালয়েরই কর্মপরিধির মধ্যে পড়ে। গ্রাম উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প তৈরী করতে গেলে সকল মন্ত্রণালয়েরই সর্বাত্মক সহযোগিতামূলক অংশ গ্রহণ আবশ্যক, কিন্তু এই প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিক চরিত্রের উপরই একটা হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

সেক্টর পর্যায়ে গ্রাম উন্নয়নের কাজ চালানো যেতে পারে, কিন্তু জাতীয় ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়নের জন্যে বহু সেক্টরকে একসাথে কাজ করে যেতে হবে। সংক্ষেপে এতটুকু বলা যেতে পারে, বর্তমান চরিত্রের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যদি কাজ চালাবার চেষ্টা করা হয় তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অবাঞ্ছিত হয়ে দাঁড়াবে।"[৯]

এই সমস্যাটি বাস্তবে যে কতটুকু তীব্র হয়ে দেখা দেয় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'সুফলা নোয়াখালী' প্রকল্প।[১০] এ ধরণের ভবিষ্যতই মেনে নিতে হয়েছে স্বেচ্ছাশ্রমের প্রায় প্রতিটি প্রকল্পকে। এ সবের ফলে প্রধান যে ঘটনাটি ঘটেছে তা হলো শ্রমের অপব্যয়। অথচ উন্নয়নের শ্লোগান তুলে আজকে আমাদের দেশে যে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে তার চরিত্রই এই। সে ক্ষেত্রে উন্নয়নের শ্লোগান যে নেহাৎ অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর তা উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

৯। দারিদ্রের বিরুদ্ধে দরিদ্রের সংগ্রাম ঃ আবু জাফর্ ওবায়দুল্লাহ খান, বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা ১৯৭৬ পৃঃ ১৯

১০। দ্রষ্টব্য ঃ সুফলা নোয়াখালী সংক্রান্ত গ্রাম গবেষণা প্রকল্পের ৯নং রিপোর্ট।

এখানে প্রশ্ন উঠবে তা হলে গ্রামোন্নয়নের পথ কি হতে পারে কিংবা এধরণের প্রকল্পের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হিসেবে কাকে শনাক্ত করবো। এ প্রশ্নের উত্তর একটিই: গ্রাম উন্নয়নের প্রধান ভিত্তিটি হচ্ছে সম্পদ ও সমতার পুর্ণবণ্টনের রাজনৈতিক প্রশ্নে। সেই প্রশ্নটিকে অমিমাংসীত রেখে আমাদের এগুবার সমস্ত পথই রুদ্ধ। গ্রামোন্নয়নের এই রাজনৈতিক প্রশ্নটি সমাধান করতে হলে প্রথমেই দরকার ভূমি-সংস্কারের। আমরা কাগজে কলমে যতই ভূমি সংস্কারের কথা বলি না কেন বাস্তবে তার সামান্যও সম্পাদন করিনা বা করা সম্ভব হয়না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গলব্রেথ লিখেছেন---‘অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনুন্নত দেশগুলোর ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত বর্তমান আলোচনা এমনভাবে এগুচ্ছে যে তা দেখে মনে হয় যে কোন দেশের সরকার তার প্রাক্তণ সৈনিকদের পেনশন দানের মতো কোন এক প্রোজ্জ্বল সকালে হয়তো ঘোষণা করতে পারেন যে যারা চাষ করে তাদেরই জমি। এ কথা তো ঠিক যে, ভূমি সংস্কার একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ-এর ফলে এক শ্রেণীর ক্ষমতা, সম্পত্তি, প্রতিপত্তি সম্পূর্ণভাবে অন্য একটি শ্রেণীর হাতে চলে যায়। কোন দেশের একটি সরকার যদি ভূমি মালিক শ্রেণী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা গভীরভাবে প্রভাবাণ্বিত হয়ে থাকে---তবে ভূমি সংস্কারে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হওয়ার কথা জেনে শুনেও সরকারের এতদসংক্রান্ত আদেশকে স্বাগতঃ জানাতে তারা পারে না। এ জগতে বিভিন্ন ধরণের মানুষই বাস করে তবে যারা জমির মালিক তারা মোটামুটি প্রায় একই ধরণের---তা তারা চীন, পারস্য, মিসিসিপি বা কুইবেক---যে কোন দেশের অধিবাসী হোক না কেন। তাদের কাছ থেকে অন্ততঃ এতটুকু আশা করা উচিত হবে না যে তারা সব খুশী মনে একত্রিত হবে এবং এতদিন ধরে রাখা ক্ষমতা, ঐতিহ্য এবং অন্যান্য স্বত্ব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করবে।”[১১]

ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বিদেশী কারিগরী সহযোগিতা ও সাহায্য। আমাদের দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়োজিত বিদেশী সাহায্য ও কারিগরী সংস্থাগুলো উন্নয়নের যে ধারণার বশবর্তী

---

১১. Condition for Economic change in Underdeveloped Countries : J. K. Galbraith Journal of Farm Economies Vol. 33 PP 695-6. (অনু : আতিউর রহমান)

হয়ে কাজে অগ্রসর হন তা হলো উৎপাদন বৃদ্ধি। ফলে তাদের দেয়া প্রকল্প সাহায্যাধীন সহযোগিতা এমন সব প্রকল্পে ব্যয়িত হয় যেখান থেকে সবচেয়ে দ্রুত সবচেয়ে বেশী রেট অব রিটার্ণ হবে। এই ধরণের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না বরং তা পরোক্ষভাবে তাদের সপক্ষেই কাজ করে যারা ভূমি সংস্কারের বিরোধিতা করছেন।

এসব সমস্যার সহজ সমাধান আমরা লক্ষ্য করি চীনে। চীনের ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটানোর পদক্ষেপ নেয়া হয় ১৯৪৭ সালে এবং চীনের এই প্রয়াস অত্যন্ত সার্থকতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।[১২]

গ্রাম উন্নয়নের সমস্যার আরেকটি সমাধান দিয়েছেন আমাদের পরিকল্পনাবিদরা। তা হলো লাগসই টেকনোলজি। তাঁরা বলছেন ''যদি গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী সত্যিই সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হয় তবে দরিদ্র ও দরিদ্রতম দেশগুলোকে এমন প্রযুক্তিমানের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে যা কম নিয়ে বেশী দেয় এবং যা সত্যিকার অর্থে লাগসই হবে।'' [১৩] এই পথটির কথাই আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের দ্বিতীয় পথ হিসেবে। আমরা বলেছি জটিল যন্ত্রপাতির নিজস্ব উৎপাদন। সেটি প্রথম অবস্থায় যখন সম্ভব হচ্ছে না ততদিন প্রাপ্ত যন্ত্রপাতিকে যতদূর সম্ভব ব্যবহার উপযোগী আধুনিকায়িত করে নিয়ে ব্যবহার করার কথাই এ ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও আমরা চীনের উদাহরণটি স্মরণ করতে পারি। চীনে ১৯৫৮ সালে পরিচালিত Backyard Blast Farnace Movement-এর প্রধান লক্ষ্যই ছিলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী, বৃহদাকৃতির কলকারখানা আর পশ্চিমা কারিগরী জ্ঞান ছাড়াও যে শিল্পায়ন সম্ভব তা প্রমাণ করা। চীন সেখানেও সাফল্য অর্জন করেছে। স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে কলকারখানা স্থাপন ও শিল্পায়নের প্রয়াস যে সার্থকতা লাভ করতে পারে চীনের এই আন্দোলনের পর তা অত্যন্ত সহজ স্বীকৃত বাস্তবতা। কৃষির

---

১২. চীন অনুসৃত ভূমি সংস্কার নীতিমালার জন্যে দ্রষ্টব্য Essential Points in Land Reform in the New Liberated Area, Mao Tse Tung Selected Works. Vol. IV PP. 201-2

১৩. দ্রষ্টব্য আবু জাফর ওবায়েদুল্লাহ খানের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ২১

ক্ষেত্রে এই লাগসই টেকনোলজির ব্যবহার দেখিয়েছে তানজানিয়া।[১৪] তানজানিয়ার দৃষ্টান্ত স্মরণ করলে দেখতে পাই যে, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রত্যাশায় বসে থাকা কিংবা তাকেই প্রধান বলে পরিগণনা করা—এই দুই পথই তারা বর্জন করেছে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কৃষিবিদ্যায় বাস্তবকাজের দক্ষতাকে দেয়া হয়েছে অগ্রাধিকার। এই ক্ষেত্রে টেকনোলজি নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নটির অত্যন্ত সহজ সমাধান তাঁরা তৈরী করেছেন যে, স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন বা স্থানীয় চরিত্র মাফিক পরিবর্তনই একমাত্র পথ।

এরপরে দেখা যাক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় জালটি আমাদের কিভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেধে ফেলেছে। একথা আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার যে, তৃতীয় ভুবনের দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা সমূহের সাহায্যের চরিত্র সম্পূর্ণই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আপাতঃ দৃষ্টে এসব সংস্থা স্বাধীন, সেবামূলক ও উন্নয়নকামী বলে অনুমিত হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে এদের কলকাঠিটি যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর করতলগত তা এসব সংস্থার কার্যকলাপ অভিনিবেশের সাথে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এ সব সংস্থার অর্থ জোগান দেয় সে সব মাল্টিন্যাশনাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তারাই আবার পরে এসব উন্নয়নকামী দেশগুলোর কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করে মুনাফা লোটে। ঋণ আর সাহায্যের দান সংগ্রহের সাথে সাথে আমাদের মতো তৃতীয় ভুবনের দেশগুলো এই চুক্তিও স্বাক্ষর করতে বাধ্য হই যে, আমরা কি কি দ্রব্য ও পণ্য তাদের কাছ থেকে ক্রয় করবো ফলে একদিকে আমাদের কাঁধে চেপে বসছে ঋণের বোঝা, উচ্চহার সুদের ভার আর অন্যদিকে আমরা বাধ্য হচ্ছি অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে তাদের করতলগত হয়ে থাকতে। আমাদের অধিকাংশ প্রকল্প সাহায্যের চরিত্রটি সহজ ভাষায় বলতে গেলে ঠিক এই রকমই। এসব বিদেশী সাহায্য সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বাজারে পরিণত করে রাখা, আমাদের দেশ থেকে কাঁচামালের সরবরাহটি নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থাটি সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে রাখা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে এসব আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা কখনো কখনো সরাসরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরি-

---

[১৪] দ্রষ্টব্য তানজানিয়ার UNDP/ILO পরিচালিত গ্রামীন প্রযুক্তিগত প্রকল্প রিপোর্ট।

বর্তনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে।[১৫]

যে কোনো উন্নয়নশীল দেশেই সাহায্যের রূপ হয়, প্রধানতঃ তিনটি ১, খাদ্য, ২, পণ্য ৩, প্রকল্প। এর মধ্যে খাদ্য সাহায্যই একটা বড় অংশ দখল করে রাখে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এই সাহায্য সমূহের চরিত্র ও ফলাফল কি তা খাদ্য সাহায্য চরিত্রের নির্মোহ বর্ণনাই প্রমাণ করবে।

এই সাহায্যের চরিত্র ব্যাখ্যা করে দু'জন মার্কিন সাংবাদিক অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

“..........politics—not humanitarian impulses—plays the paramonut role in the allocation of food aid” [১৬] বস্তুতপক্ষে ঘটনাটি তাই। আমাদের দেশের মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন যখন ১ কোটি ২০ লক্ষ টন তখন আমাদের আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৩৫ হাজার টন। এই সংখ্যা দু'টি প্রমাণ করছে আমরা খাদ্য শস্য আমদানীর ওপর কতটা নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী খাদ্য সাহায্যদাতা সংস্থাগুলো আমাদের সাহায্য আমাদের দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হেনরী ও বার্ডের উল্লিখিত রচনায়ও তার সপক্ষে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁরা লিখছেন “Food is not the best type of aid to give a developing country. The influx of large quantities of cheap foreign food grains denies farmers the major portion of the urban market. In 1976, Bangladesh was unable to absorb the 1.44 million

---

১৫। এ কথা প্রমাণিত হয় তেরেসা হেয়টার ও চেরিল পেয়ার রচিত দুটো গ্রন্থে। চেরিল পেয়ার তৃতীয় ভুবনের বেশ কয়েকটি দেশ--- ইন্দোনেশিয়া, চিলি, ব্রাজিল, কম্বোডিয়া, আর্জেন্টিনার সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে আই, এম, এফ, এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখিয়েছেন তাঁর The Debt Trap : The IMF & The Third World (Penguin Books, 1974) গ্রন্থে। একই ধরণের সিদ্ধান্তে পৌচেছেন তেরেসা হেয়টার তাঁর Aid as Imperalism (Penguin Books, 1971) গ্রন্থে। তৃতীয় ভুবনে সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের স্বরূপ অনুধাবনে এই দু'টি গ্রন্থ অত্যন্ত সহায়ক।

১৬. Food Bungle in Bangladesh : Donald F. McHenry and Kai Bird. Foreign Policy. Number 27, Summer 1977. pp 80.

metric tons of foreign foodgrains shipped by the international donors. The price of foodgrains plummeted throughout the country, and many peasents sold out their wheat and rice crops at a loss." [১৭] এতে করে খাদ্য শস্য 'উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদের পরোক্ষভাবে অনুৎসাহিতই করা হয়। আর স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের প্রত্যেকটি সরকারই এই নীতি অত্যন্ত চমৎকারভাবে অনুসরণ করে আসছেন। এর ফল যে কি ঘটছে তা সচেতন ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন। দ্বিতীয় যে সমস্যাটির উদ্ভব হয় তাকে ম্যাকহেনরী ও বার্ড শনাক্ত করেছেন 'relief mentality' বলে। তাঁরা লিখছেন "Bangladesh officials are convinced that the internationale donors will not allow then to starve. Since it is much easier to order a shipment of food through the embassy in Washington than to spend time and money on a domestic procurement program, a definite complacency has settled over the bureacracy. The technocrats who dominate the powerful ministries of finance, planning and food are resigned to continued reliance on American, Candian and Australian surplus food grains. One symptom of the relief mentality is a reluctance to invest too much of the country's limited recources away from the more glamorous industrial sector and low profile agricultural projects." [১৮]

বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা একটি জাতির জন্যে কি মারাত্মক অভিশাপ হয়ে নামতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে এই মানসিকতা। জাতির ও দেশের ভবিষ্যত কিভাবে অন্যের হাতে সমর্পিত হতে পারে তা আমাদের খাদ্যনীতির পরনির্ভরশীলতা দেখেই বোঝা যায়। আমাদের জীবন-মৃত্যুর এই সাধারণ সূত্রটি অন্যের হাতে সমর্পণ করে আমাদের সরকার উন্নয়নের যে বিজয়-ডঙ্কা আমাদের কানের কাছে বাজিয়ে চলেছেন তা যে আমাদের জন্যে কতটুকু পরিহাসমূলক ও মর্মবিদারক তা বলে বোঝাবার বোধকরি প্রয়োজন নেই।

১৭। পূর্বোক্ত pp. 77—78

১৮। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পৃঃ ৭৯

সামগ্রিকভাবে আমাদের উন্নয়নের সমস্ত প্রচেষ্টাই হচ্ছে এই রকম পরিহাসমূলক। একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির নিরন্ন মানুষের বহু দিনের আকাঙ্খা আর স্বপ্ন তাঁদের এই অনিশ্চয়তা ও অসহায়ত্বের কালো অমানিশার অবসানে নতুন প্রভাতের, কিন্তু সেই স্বপ্ন আর আকাঙ্খা নিয়ে চলছে পরিহাস, তাঁদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মেতে উঠেছে এক শ্রেণীর মানুষ। উন্নয়নের যে প্রত্যাশা নিয়ে কর্মক্লান্ত মানুষগুলো নিদ্রাভীভূত হয়ে আছে তাঁদের অজান্তে তাঁদের সে প্রত্যাশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতার লোভনীয় আসনে বসছে একটি শ্রেণী। আর অন্যদিকে এই যুগে প্রতিটি মানুষের মনে মুক্তির যে আশা অঙ্কুরিত হচ্ছে তাকে নস্যাৎ করে দেবার জন্যে বিভ্রান্তির কুহকী মায়াজালে বন্দী করে ফেলা হচ্ছে তাঁদের। সেই জন্যেই উন্নয়নের ধারণায় এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা। উন্নয়নের ধারণায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির পেছনে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি উদ্দেশ্যই ক্রিয়াশীল, তা হলো তৃতীয় ভুবনের দেশগুলোতে জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সমাজবিপ্লবের যে বিপ্লবী আগুন ছড়িয়ে পড়ছে তাকে প্রতিরোধ করে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের শোষণ-শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করা। তাই শ্রমজীবী জনগণের সপক্ষে ক্রিয়াশীল প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে এই বিভ্রান্তির বিপক্ষে প্রকৃত উন্নয়ন তথা সার্বিক মুক্তির বিপ্লবী তত্ত্বটি জনগণের সামনে উপস্থাপন একটি নৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একলা লখিন্দর / হাসান হাফিজ

আমার হাত
ছুঁতে পারছে না তোমার হাতের মর্ম
আমার আঙুলগুলো বঞ্চনায় নীল
সেখানে পুঁজের গন্ধ
একবার মনেও পড়েনা
সেই কবে ফোটাতাম ফুল মুখরতা

আমার পীতাভ ত্বক
আভিজাত্য তোমার ত্বকের
গ্রহণ করার মতো যোগ্য নয়
এখানে বিস্তৃত পচনশীল ঘা
একবার মনেও পড়েনা
আমার ত্বকেও ছিল ভোর জাগানিয়া সুর
দারুচিনি নবান্ননির্মিত দিন

আমার দু'চোখ
নষ্টে ভ্রষ্ট অকেজো করেছে
মানুষেরই ক্রূর কালো পাপ
লোভের লতানো লালা
সাপের তরল বিষ খেয়েছে রেটিনা
লোহার বাসরে একা লখিন্দর বেহুলা ফেরার

শামীম আরা / কামাল চৌধুরী

বছর তেরোর দূর্বিনীত কিশোর আমি
বন্য গোলাপ, তখন আমার ফোটার বয়স
খুব গোপনে ফুটতে থাকি, অহংকারে ঘাড় মাথাকে
এক করে দেই উর্ধমুখে
তখন আমার হেলায় ফেলায় উড়িয়ে দেওয়া তুড়ির বয়স।

তুড়ির ঘায়ে উড়িয়ে দিলাম তোমার সখের রাত্রিবেলা
শবেবরাত, আমার মতো হাজার কিশোর
মাথায় টুপি, বাজির প্যাকেট
তখন কেন মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দেবো ?

তখন যদি জ্বালিয়ে দিতাম মোমবাতিদের আলোর সারি
খুব বেশি কি পরাজয়ের লজ্জা আমার মাথায় যেতো,
প্রায় পঁচিশে এখন শুধু অনুতাপ ও স্মৃতির সময়
কষ্ট তোমায় খুবলে দিয়ে ফিরিয়ে নিলাম গোঁয়ার মাথা।

অহংকারে বলেছিলাম এখন আমার ঘোরার সময়
ফূর্তি করে কাটিয়ে দেবো রাত্রিবেলা
'পাঁচটি মিনিট' হায় কিশোরী তখন আমার ঘোরার সময়
ঘুরতে থাকি, উড়তে থাকি, প্রায় পচিশে পুড়তে থাকি

অন্য কোন কিশোর যদি জ্বালিয়ে দিতো মোমবাতি সব
কিইবা হতো
কিংবা ধরো আমিই যদি জ্বালিয়ে দিতাম মোমবাতিদের
কিইবা হতো

তবু আমার দূর্বিনীত ছোঁয়ার আশায় বধির দেয়াল
রাত কাটালো অন্ধকারে।.

প্রায় পঁচিশে অন্যকোন শবেবরাত সামনে পেলে মনে পড়ে
মুখের সকল কচিরেখা ঝাপসা এখন
স্মৃতির ভেতর শবেবরাত হু হু করে মধ্যরাতে মনে পড়ে
এখন আমার অনুতাপ ও মিষ্টি করে পোড়ার সময়
পুড়তে থাকি, উড়তে থাকি, গোয়ার্তুমী ঝাড়তে থাকি

তোমার নামে জালিয়ে রাখি লক্ষ হাজার মোমবাতিদের।

পরাজয় মানেনা বীর / মোহন রায়হান

পরাজয় কাকে বলো তুমি
পরাজয় মানেনাতো বীর
শতবার কাপুরুষ ভীরু
একবার বীরের বিজয়।

পরাজয় বারে বারে এসে
ফিরে যায় মাথানত করে
শানানো ছুরির মত আমি
তীক্ষ্ণ হয়ে উঠি প্রতিবার।

বীর বাহু পরাজিত নয়
পরাজিত নয় কোনো যোদ্ধা
রক্তে লাল হয় হোক বুক
তবু হটবোনা পিছু আমি।

বুনো শুয়োরের ডাক শুনি
ঘোরতর দুঃখময় চোখে
তবু যেতে হবে দূর গ্রামে
পরাজিত নই আমি নিজে।

আকাঙ্খা / শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

তোমার আকাশে তারা নেই কোন?
কতগুলো? কেমন? কি তারা?
আমার আকাশ গাঢ় অন্ধকার
পারিনা পাপড়ি মেলে দিতে
সমস্ত অন্তর জুড়ে জেগে থাকে ভয়।

কি করে বুঝাই, কা'কে বলি আমি
ফুটে থাকবার সাধ হয় চিরকাল
গাঢ় অন্ধকার থেকে বের হয়ে
আলো দিয়ে ভরে তুলি ভেতর-বাহির।

মৃত্যু এসে দাঁড়ায় নিকটে
যেনো কটিদেশ থেকে অস্ত্রের ঝনৎকার
বেজে ওঠে
আভূমি মৃত্যুর কাছে নুয়ে বলি---
আরেকটু সময়, আর একটু

এভাবে সময় কতকাল কেটে যাবে
কতোকাল আর মৃত্যুর ভয়ে আড়ষ্ঠ হবো
সুন্দর কল্যাণ কিছু করে যাবো
এরকম প্রতিশ্রুতি কতোবার দেবো?

ফুটে থাকবার আকাঙ্খা আমার চিরকাল
কি করে থাকবো ফুটে
কিভাবে কিভাবে
মৃত্যুকে ফেরাবো কতবার আর?

তখন কে জানতো / রেজা সেলিম

তখন কে জানতো এই বনবাস একদিন
নিখিলের হরিৎ প্রণয় হবে, প্রিয় পুষ্পের সমূহ পরাগ
বিস্তৃত বুকে পুনরায় নেবে ঠাঁই-অভিমান মুছে গিয়ে
চোখের কাজলে হবে সরসীর মৃদু নেত্রপাত?
তখন কেউ জানতো এই স্থবির অরণ্যপথে
ধূলোবালি মেখে শরীরে আভায় ফিরবে রাখাল?
বাজবে বাঁশি পুনঃ বুনো বাতাসে
পত্রপুট সহাস্যে জানাবে প্রণয়ের সম্মতি?

মানুষ জানে না প্রেমের প্রিয় বাসনা
প্রিয় মৃত্যুর চেয়ে শ্রেয়, যদিও সত্য বলে জানি
এই উদাস বুনো-পথ বুনো হাওয়া কোন কিছু ভ্রান্ত কিছু নয়
উদাসীনতাই সকল সুন্দর থেকে সুন্দর।

তবু কি কেউ কখনো জানতো এই সরলতা
এই স্বাভাবিক গতিবিধি মানুষের প্রিয় আচরণ
সংযত সংসারী হবে?
হয়তো কেউ জানতো---কেউ জানতো না।

এই দিন / হোসেন সোহরাব

গভীর আঁধারে আজ কাঁদে কে উঠোনে?
আশার আগুন স্তব্ধ বাতাসে মাটিতে মিশে যায়
অনেক রাতের পরেও কেন যে মিথ্যার আলো জ্বলে!

সারারাত সারাদিন বেদনার ধ্বনি
চন্দন চিতার মতো পোড়ে মানুষের দগ্ধবুক,
অন্ধকারে নড়বড়ে ভিটে ধ্বসে পড়ে
চোখের সামনে শুধু খেলা করে শূণ্যতা, শূন্যতা ------

গ্যাস বেলুনের মতো স্বপ্ন ওড়ে নিঃস্বপ্নের কোলে
এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘিরে জিরাফের ছায়া দীর্ঘ হয়
আতুর ঘরের শিশু মায়ের উরুতে অসহায়
প্রতিমার বুক কেন আজ শুধু পাথর, পাথর --- ---।

কি চাও এভাবে তুমি? এভাবে ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাবে,
ক্ষয়ে যায় কলাপাতা ঘেরা গেরস্তের আটচালা
সৌভাগ্যের দানাপানি ভাগ্যবান চেটেপুটে খায়
ভাগ্যের বন্দন নেই কে কাঁদে উঠোনে?
কে কাঁদে উঠোনে? এই দিন কেন যে এমন!

সাহসের সে সমরে/ফারুক হাসান

জনতার ঢেউ আসে রাজপথ কেঁপে ওঠে আজ
ঢেউয়ের কণ্ঠে দেখো মিশে আছে সব প্রতিবাদ।

অনেক হয়েছে খেলা, ভুলে যাও সেইসব স্মৃতি
ভুলে যাও ছলাকলা পা'চাটা হে কুত্তার দল।
ভুলে যাও সেইদিন---ভুলে যাবো কোমল কথায়।
ভয় নেই আর ক্রুর পীড়নের কোন শোষকের।
অনেক হয়েছে খেলা আর নয় মৌন পরাজয়
জনতার ঢেউ আসে পদাঘাতে কাঁপে রাজপথ।
মিছিলে শ্লোগানে আসে প্রতিবাদ, জাগে প্রতিরোধ
কাঁপে ওই দেখো চেয়ে শোষণের কুটিল প্রাসাদ;
চেয়ে দেখো বুঝি আজ ওই ভাঙ্গে পীড়নের যন্ত্র।
মিছিলে শ্লোগানে আসে প্রতিবাদ ভাঙ্গনের সুর।

সে মিছিলে যেতে হবে, দ্বিধাহীন সাহসী সমরে।
প্রতিবাদে প্রতিরোধে সে সমরে মিছিলের আগে
আমি যেন দৃঢ়প্রাণ কোন এক প্রিয় যোদ্ধা হই;
আমি যেন জ্বলে উঠি সাহসের আগুন আলোয়।

অবরোহন / ফারুক মঈনউদ্দীন

রোববার দিনটা বরাবরই কেমন যেন অন্যরকম লাগে টিপুর কাছে। অন্য কিছুর দিকে তাকাতে হয় না, রোদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় আজ রোববার। রোদের এই গা এলানো অলস ভঙ্গীটা সপ্তাহের আর ছয়দিন দেখা যায় না। দরজার বাইরে পা দিয়ে চারদিকে তাকায় টিপু—রাস্তায় ঢেলে, দেয়ালে হেলান দিয়ে কি নির্বিবাদে জাবর কাটছে রোদের হলুদ শরীর। ওকে দরজার বাইরে দেখে বড় মামা বলে ওঠেন, 'কোথাও যাবিনা টিপু, ব্যাটারা যে কখন আসে ঠিক নেই।' কোন জবাব দেয় না ও। আজকের রোববারটাও মাসের আর রোববারগুলোর মত। তবু ও গুলোর সাথে আজকের কি একটা সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে ধরতে পারছেনা ও।

টিপুর তিন মামার তিন পরিবার থাকেন এখানে জায়গাটা শহরের ভেতরে হলেও গ্রামের পরিবেশ। ইটের সরু গলি দিয়ে ঢুকতেই টিউবওয়েল, তারপর গরুর খাটাল, পাশে প্লাষ্টারহীন ল্যাট্রিন ; তার দাঁত বের করা দেওয়ালে গোবরের ঘুঁটে জলবসন্তের মতো ফুটে আছে। হাতের ডান পাশে একটা হাস্নাহেনার ঝাড় তার নিশাচর সৌরভ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুটি-শুটি মেরে। তারপর এক সারিতে শনের তিনটি বড় ঘর, সিমেন্ট করা মসৃণ মেঝো। তিনটে পরিবার একান্নবর্তী না হলেও গ্রামের বাড়ীর মতো পাশাপাশি ঘরের মধ্যে একটা গ্রামীন সৌহার্দের মায়াময় প্রলেপ আছে। অন্যান্য দিনের চাইতেও বাড়ীটাকে একটু জমজমাট মনে হচ্ছে আজ।

রেশন কার্ড চেক হবে, তাই সবাই আগে ইস্যু করা অতিরিক্ত কার্ডের সমর্থনে আত্মীয়-স্বজন জোগাড় করে রেখেছেন ইন্সপেক্টরকে দেখানোর জন্য। টিপুর মা আর ছোট ভাই এসেছেন গ্রামের বাড়ী থেকে বড় মামার পরিবারের সদস্য হিসেবে। টিপু সত্যিকারের ফ্যামিলি মেম্বার, কারণ ও বড় মামার বাসায় থেকে লেখাপড়া করছে। ওর বাবা ডেলী প্যাসেঞ্জার

চাকুরে, আজ এখানে থেকে গেছেন ছোট মামার একটা বাড়তি কার্ডের সমর্থনে। মেজমামার শাশুড়ী এসেছেন দুই মেয়ে নিয়ে জামাইর সংসারে।

দিনটাকে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না হিসেব মতো। অন্যদিন হলে এতক্ষণে সিলেট রেষ্টুরেণ্ট কিম্বা ব্রীজ হোটেলে জমে যেত ও। ঘর দোর বিস্মৃত হওয়া তিন কাপ চা কে পাঁচটা বানিয়ে খাওয়া কিম্বা অনর্থক 'গেলি' বলে চেঁচিয়ে ওঠা অন্যান্য ছুটির দিনগুলো সত্যিই আজকের চাইতে আলাদা। ভেতর থেকে একটা অস্থির বোধ গলার কাছে এসে আটকে আছে। কোন ঘটনার আগে অবশ্য সব সময়ই এরকম হয় ওর কারণে অকারণে। এমনকি বাসে উঠলে উদ্দিষ্ট ষ্টপেজে নামার আগেও এমন এক অনুভব ওর গলার কাছটাতে বল্‌কাতে থাকে। শালারা কখন যে আসবে, আজকের সব দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ব্যাটাদের স্বভাব-চরিত্র ভালো করেই জানা আছে ওর, অনর্থক একটা ঘাপলা বাধিয়ে বসবে। এক একটা ঢেঁকী শালারা, কাঠ খোট্টা শকুন। ফুড অফিসের কথা মনে হতেই বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে আসে ওর। কট্টর সংসারবাদী এ'সব ভাবনা-চিন্তার কোলাহলে ওর স্বপ্নের মত রোববারটা মাটি হয়ে যায়।

বড়মামা মাঝে মাঝে খবরদারী করছেন একে ওকে, 'খবরদার বাইরে যাবি না।' রতন গেটের দিকে যাচ্ছিল উনি হেঁকে উঠলেন, ''এ্যাই কোথায় যাচ্ছিস?' রতন এই তো সামনে বলে পা বাড়াতেই উনি ধমক দিলেন, 'কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, কখন ব্যাটারা এসে হুট করে সবাইকে ডেকে বসে ঠিক নাই, তখন তোকে খুঁজতে যাবো কোন জাহান্নামে? আড্ডাবাজীটা একদিনের জন্য বন্ধ রাখতে পারিসনা?' রতন বোধ হয় আইন অমান্য করার জন্যই কয়েক পা এগিয়ে ফের তেতো মুখে ফিরে এলো গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে। বড়মামা ততক্ষণে ছোট্ট বালতিতে সাবানের ফেনা গুলতে বসে গিয়েছেন। গতকাল পনেরো টাকায় কেনা পুরোন সার্টটা ফেনার নরম আদরে ডোবাতে ডোবাতে টিপুর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেজায় সস্তায় পেয়ে গেলাম জামাটা। একদম নতুনের মতো, দেখেন।' বাবা পৈঠার উপর বসতে বসতে বললেন, 'নতুন না কচু, তেজপাতার মতো কলার দেখলে কি বলবে ওটা নতুন।' মামার মুখের উপর খানেকটা ছায়া ঝুলে পড়লো। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উড়িয়ে দেবার মতো

বললেন, 'রেখে দেন আপনার কলার, কলার দিয়ে কি করবো, কাপড়টা দেখে কোন শালা বলবে এটা পুরান। হেসে খেলে এক বছর চলে যাবে।' টিপুর বাবা ম্যাচের কাঠি কানের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে প্রায় বোঁজা চোখে বললেন, 'তা ঠিক, পনেরো টাকার সার্টের আবার কলার।' তারপর সোজা হয়ে বসে কাঠিটা লুঙ্গীতে মুছে নিয়ে বাক্সে ঢুকিয়ে রাখলেন। মামা শার্টটাকে কিছু সময় কচলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন লুঙ্গীতে হাত মুছে। ঘর থেকে দুটো সিগারেট নিয়ে টিপুর বাবার কাছে বসলেন জুৎ করে।

টিপু দেখে শালার সাথে চমৎকার জমে গেছেন বাবা। ওর খুব অস্থির লাগে। একটা সিগারেট খাওয়ার জন্য ভেতর থেকে প্রবল টান অনুভব করে। কিন্তু বেরুনো যাবেনা, খিচড়ে উঠবেন দু'জনই। মেজ মামার ঘরে যায় ও। মামাত বোনটা একটা রংচটা পাজামাকে উল্টিয়ে ফের শেলাই করছে নতুন করে। দেখে খুব বাজে লাগে ওর। মেয়েটার সুবিশাল চোখ, গালের 'আয়, আয়', ডাক দেওয়া তিলটা মুহূর্তেই অসার হয়ে যায় ওর কাছে। হয়তো পৃথিবীর সব সৌন্দর্যের পেছনে এমনি কোন কদর্যতা মুখ ব্যাদান করে আছে। দরজা থেকে ফিরে আসে ও।

বড়মামী মামাকে বললেন, 'একটু বাজারের দিকে যাওনা, মাছ-টাছ যদি কিছু পাওয়া যায়।' মামা আঁতকে ওঠার ভঙ্গী করলেন, 'মাথা খারাপ আমি বাজারে যাই, আর শালারা এসে হেড অব্ দি ফ্যামিলীকে বাদ দিয়ে দিক। তার চাইতে দোকানে কাউকে পাঠিয়ে ডিম-টিম যাহোক একটা কিছু আনিয়ে নাও। রেশন কার্ড ঠিক থাকলে অনেক ভাল মাছ খাওয়ার চান্স পাবে।' বাবা সায় দিলেন, ঠিক ঠিক, বাজারে যাওয়া উচিত হবেনা।' মামা বললেন, 'আরে দূর, পাগল নাকি।' টিপুর মনে হলো মামা সীমিত টাকা নিয়ে রোববারের বাজারে ঢোকার অসহায়ত্বটাকে কৌশলে পাশ কাটালেন। এ'সব দেখে শুনে টিপুর মনটা অকারণে ভারী হয়ে যায়। রোববারের আবেশটা ঘুন পোকার মতো ঝুর ঝুর করে ঝরে যেতে থাকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে।

দুপুরের দিকে উৎকণ্ঠা বেড়ে যায় সবার। মেজ মামা বলেন, 'গেল কোথায় শালারা, আসবেনা নাকি?' বাবা বলেন, আরে আসবে আসবে, না এসে যাবে কোথায়।' সন্দেহ প্রকাশ করলেন মেজমামা, 'নাকি সার-

প্রাইজ ভিজিট দেবে আরেক দিন?' বড়মামা 'দুর ছুটির দিন ছাড়া আসে নাকি?' বলতে বলতে ঘরের দিকে চলে গেলেন। মেজমামা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আরে আসে আসে, শালারা যা ইচ্ছে তা করতে পারে, এদের আবার নিয়ম কানুন।'

বড়মামা সরে গিয়ে আবার নিজের মাকে ধমক দিচ্ছেন, 'মিছে কথাও বলবোনা? কেন বলবোনা? দুনিয়াতে কোন শালা সত্য কথা বলে দেখাও তো?' বৃদ্ধা কি বললেন বোঝা গেলনা। মামার গলা শোনা গেল, 'আরে রাখ, ওসব বুঝবেনা তুমি।' বাইরে এসে বিড় বিড় করে কি যেন বললেন মামা, বোঝা গেলনা। মেজমামা বললেন, 'সবকিছুতেই মা'র বাড়াবাড়ি।' টিপু রান্না ঘরের দিকে যায়। মামীকে বলে, 'মামী একটা চুলো খালি করে দাওনা, চা বানাই।' মামী বলেন, 'দুধ নাই রং চা খাবি?' 'ছোট মামীর কাছ থেকে এনে দাও।' মামী হুঁঃ করে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন, 'আনতে গেলে ওদের ঘরে কিছু থাকে না।' টিপু 'দাঁড়াও, আমি পাই কিনা দেখি' বলে চলে যায়। ছোট মামীর কাছ থেকে আধ কাপ দুধ নিয়ে আসার সময় জিজ্ঞেস করে, 'মামা আপনারা চা খাবেন?' মামা কথা থামিয়ে বলেন, 'দুধ পেলি কোথায়?' তারপর বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খাবো মানে? এতক্ষণ তো তোর মামীর ভয়ে চাই নি। ফাস্ ক্লাশ করে বানাবি।' দুপুরে ভাত খাওয়ার পর টিপু চুপি চুপি দোকানে ছোটে। মাত্র কয়েক টানে একটা সিগারেটকে ধোঁয়া বানিয়ে ফিরে আসে বাসায়। দুপুরটা তখন কাৎ হয়ে পড়ে আছে বিকেলের পথের উপর। মামা বললেন, 'আমি একটু শুই, তোরা খেয়াল রাখিস্। কিছুক্ষণ পর টিপু ওঘরে গেলেই উনি লাফিয়ে ওঠেন, 'এসেছে নাকি?' ও হেসে বলে, ''না, আপনি ঘুমান' ওরা এলো আরো অনেক পরে। গাছের ছায়ারা তাদের ক্লান্ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিকেলের দিকে। বড়মামা খবর পেয়ে ঘুম জড়ানো চোখে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে ছুটে এলেন। টিপুর বুকের ভেতরের চাপা ঝড়টা আরো অস্থির বেগে দাপাদাপি করতে লাগলো।

ওরা দু'জন; একজনের গায়ে টকটকে লাল বিদেশী গেঞ্জী, পকেট থেকে বেঢপ সাইজে ফুলে আছে গোল্ড লীফের প্যাকেট। আরেক জনের চেহারা দেখলে শেয়ালের কথা মনে পড়ে যায়। বড়মামা আসেন আসেন' বলে

ঘরে ডেকে নিয়ে যান ওদেরকে। তারপর নিজেই দুখানা চেয়ার এগিয়ে দেন। ওরা 'বসবোনা' বলে চেয়ারদুখানা দখল করে। মামা নোংরা তেলচিটচিটে কার্ডগুলো ওদের হাতে দেন। লাল গেঞ্জী ওগুলো দেখতে দেখতে বললো, 'ফ্যামিলির সবাইকে ডাকেন।' বড়মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কইরে তোরা এখানে আয়। সবাই উপস্থিত ছিল, মামী আর টিপুর মা ছিলেন পর্দার আড়ালে। বড়মামা 'একটু চা' বলে মামীর দিকে তাকাতেই উনার ভ্রূকুটি দেখে থেমে যান। মামী শাশুড়ীর হাত ধরে বলেন, 'মা আপনিও আসেন।' টিপু দেখে মামার গলার হাড়টা ঘণ ঘণ ওঠানামা করছে। লাল গেঞ্জী উনাকে বললো, আফাজউদ্দীন কে, আপনিই ?' মামা বলেন, 'জী জী, আমি।' টিপুর মাকে দেখিয়ে বললো, 'আর ইনি মিসেস আফাজ উদ্দীন ?' মামা ব্যস্ত হয়ে মামীকে দেখিয়ে দেন, 'না না, এই যে ইনি। 'ও আচ্ছা।' শাহেরা খাতুন কে ?' মামা টিপুর মাকে দেখিয়ে দেন, 'ইনি শাহেরা খাতুন।' 'আপনার কি হন ইনি ?' মামা ঢোক গিলে বললেন, 'আমার বোন।' 'বোন ?' কপাল কোঁচকায় লোকটা, আপনার ফ্যামিলি মেম্বার ? ডিপেণ্ডেণ্ট ?' মামা একটু কাঁপা গলায় বললেন, 'অফকোর্স ডিপেণ্ডেণ্ট।' 'আচ্ছা, আসিয়া খাতুন ?' মামা বললেন, 'এই যে ইনি, আমার মা।' 'মমতাজুর রহমান ? মামা রতনকে দেখিয়ে দেন, 'আমার ছেলে।' 'আমিরুল ইসলাম ?' টিপুকে দেখান মামা। 'ছেলে ?' মামা বললেন, 'হ্যাঁ।' টিপুর কানের ভেতর প্রবল ঘূর্ণিঝড়, মা'র দিকে তাকালো ও, মনে হলো এক্ষুনি ফিট হয়ে পড়ে যাবেন। 'আচ্ছা, মাইনর কার্ড তিনটা, মাষ্টার স্বপন, তপন, দীপু। এই তিন ছেলে আপনার ?' মামার কপালে ঘামের শিশির। 'হ্যাঁ—না, এটা এই বোনের ছেলে,' দীপুকে দেখিয়ে বলেন মামা। শেয়ালমুখো লোকটা দীপুকে কাছে ডাকে। মামাকে দেখিয়ে বলে, 'তোমার মামা ?' দীপু উপরে নীচে মাথা নাড়ে। 'কোন স্কুলে তুমি ?' শেখপাড়া প্রাইমারী স্কুলে', ফ্যাস ফ্যাস গলায় বলে দীপু। 'এটা আবার কোথায় ?' কপাল কোচকায় লোকটা। 'সীতাকুণ্ড' দীপু বলে। 'আচ্ছা তাই নাকি ? মামার দিকে এক ঝলক তাকায় লোকটা, 'ওখানেই থাকেন ?' উপর নীচে মাথা নাড়ে দীপু। 'তাহলে এখানে কেন এসেছ ?' জানতে চায় লোকটা। দীপু লজ্জা পাওয়ার স্বরে বললো 'বেড়াতে।' মামার দিকে তাকিয়ে থাকে লোকটা, ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি।

মামার চোয়াল ঝুলে পড়ে নীচের দিকে। ঘরের কেউ একটা কথা বলেনা, টিপুর হঠাৎ মনে হয় ওর ঘাড়ের উপরের চুল সব খাড়া হয়ে উঠেছে। লোক দু'জন পরস্পরের সাথে কি যেন কথা বলে মৃদু স্বরে, এক সময় হেসে ওঠে নিজেরা। টিপু দেখে মার চোখ ছল ছল করছে।

লাল গেঞ্জী রেশন কার্ডের তোড়া থেকে দু'টো কার্ড বেছে বের করে নেয়, একটা খাতা খুলে কি যেন লিখে। অন্যজন বাকী কার্ডগুলোর উপরে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে সাইন দেয়। তারপর ওগুলো মামার হাতে দিয়ে বলে, 'চলি আফাজ সাহেব।' মামা কোন জবাব না দিয়ে শুধু চোখে চেয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে টিপুর মা একটা প্লাষ্টিকের ঝুড়িতে কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ে বলেন, 'টিপু তোর বাবাকে তাড়াতাড়ি আসতে বল, না হলে ট্রেন পাওয়া যাবেনা।'

টিপু কোন জবাব দেয়না, নিঃশব্দে চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তার দিকে হাটতে থাকে। ওর প্রিয় রোববারের সূর্য তখন দ্রুত নেমে যাচ্ছে অস্তাচলের দিকে।

অন্ধ / ইসহাক খান

তিনবার টোকা পড়ে দরজায়। মৃদু মৃদু। বহুদূর থেকে ভেসে আসা শব্দ তরঙ্গ। মনে হয় দেয়ালের গায়ে টিক টিকি ডাকে, ঠিক-ঠিক। এক দুবার দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ে। চারপাশে ঘন নিরবতা। গভীর পানিতে কলসি ডুবে গেল যেন। বাতাস সামান্য ঢেউ দেয় পানির ওপর। টুব শব্দ করে সংগে সংগে মিলিয়ে যায়।

‘ক্যার’ ‘ক্যার’ শব্দে দরোজা খুলে গেল। দরজার পাল্লা অনেককাল আগে বন্ধ করে রাখা, এমন জং ধরা শব্দ। শব্দের কাতরানি অনেকক্ষণ বয়ে বেড়ায়। ক্ষীণ হতে হতে কবাটের সামান্য ফাঁকের মধ্যে অস্পষ্ট একটি মুখ, উস্কো খুস্কো বাবড়ি চুল, কচুরির বালার মত ঘন দাঁড়ি, জ্বল জ্বলে চোখে অন্ধকার চিবিয়ে চিবিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

ঃ কে? নিনীর কণ্ঠ ফোঁড়ে ভয়ার্ত হয়ে বেরোয়। নিঃশব্দে ঘরে আসে একজন যুবক। যেন হাবসি দাস, হাসি কেড়ে নিয়েছে তার। চোখের মণি ভগ্ন স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে। ক্রুর এবং ম্লান। ময়লা চাদরে গা ঢাকা। চাদরের মধ্যে হাত দুটো রহস্যাবৃত। নিনি চমকে পেছনে ফেরে। তাকায় আড়চোখে।

নিনির মা এশার নামাজ পড়ছে পাশের ঘরে। শীতল পাটিতে দু'হাটু ভাজিয়ে প্রার্থনা করে, রাব্বানা, আতানা ফিদ্‌দুনিয়া - - - -। নিনি শব্দ শোনে। আগন্তুক চোখ ডুবিয়ে দেখছে। দৃষ্টি গেঁথে গেঁথে যাচ্ছে। অসহ্য। চোখজোড়া হিংস্র। দেখতে দেখতে হাওয়ার মধ্যে তলিয়ে যায় নিনি। আরও একবার এই হিংস্র চোখ দেখেছিল নিনি। ভয়ংকর ভাবে দেখেছিল। আচমকা তীব্র শব্দে নিনীর ঘুম ভেঙে যায় সে রাতে। চোখ রগড়িয়ে কিছু বুঝাতে----হাসানকে দেখে জড়সড় হয়ে চেয়ারের আড়ালে। নিনি বলতে চেয়েছিল, ভাইয়া, তুমি অমনি করছো কেন? কার জন্য তুমি মৃত্যুর ভয়ে এমন ভীত সন্ত্রস্ত? চোখ মেলে দেখে ঘরে যারা ঢুকেছে সবার হাতে অস্ত্র।

নিনীর চিন্তা ধক্কল খেয়ে পালায়। এখানে সেখানে করুন আর্তনাদ, সেই আর্তনাদ উপেক্ষা করে যারা এসেছে, নিনি খুব সহজে একজনকে চিনলো সংগে সংগে ঝড় উঠলো বুকে। কান্না উপচিয়ে ওঠে। বন্ধুর বুকে পিস্তল উঁচিয়ে বন্ধুর নিঃশ্বাসে ধক্কল নেই। নিনি সামনের পিস্তলওয়ালাকে বলতে চাইলো.---বাদল ভাই, তুমি হাসানকে খুন করছো? বাদল ভাই, আমি নিনি, তুমি যাকে ঠাট্টা করে তিতানুন বলতে। আমি তোমাকে বলতাম কালমেঘ। তুমি রসের জের টেনে এমন ভঙ্গিতে আমায় আক্রমণ করতে, আমি কেঁদে ফেলতাম। আবার তুমি আদর করতে। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসতে তুমি। হাসতে হাসতে হঠাৎ এত গম্ভীর কপটতা মুখাবয়বে এসে পড়তো, মনে হতো তুমি মূক, তোমার জিভ কেটে ফেলা হয়েছে, তুমি হাসতে জাননা। নিনি পুরনো স্মৃতি হাতড়িয়ে সেই হাসি, সেই অভিনয় আর জীবনের এই জটিলতা দুটোর মিল খূজলো। কিছুই নেই। এতটু স্মৃতিচিহ্ন নেই যেখানে আশ্রয় করা যায়। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হাসান নির্বিকার। নিনি হাসানের শঙ্কিত মুখ দেখেছিল প্রথম। পরে দেখলো নির্মল, শান্ত। কিছু বলবে কি, এই বাদল, তোর মনে আছে, আমরা পাঠশালায় সুর করে কবিতা পড়তাম, পাখি সব করে রব---।

একই মহল্লায় দুজন বড় হয়েছে। একই মাঠে খেলেছে। গলায় গলায় ভাব ছিল। আবার মারামারি করেছে ঘুড়ির সূতো কাটা নিয়ে। পাড়ার ফুটবল টিমে দুজন সমান দাপটে খেলেছে। বাদল দুজনকে কাটিয়ে হাসানকে বল দিলে, হাসান মাটি কামড়ে শট্ করে বল জালে ঢুকিয়েছে। দু'জন চিলের মত উড়ে এসে চুমু দিয়েছে কপালে। পরীক্ষার সময় দুজনের পাশাপাশি সীট। কথা হতো টুকটাক। এই হাসান, আমার অংক মিলছেনা, তোর রেজাল্ট কত হয়েছে?

তারপর সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। হাজার বছরের বিচ্ছিন্ন অন্ধকার চিড়ে উঠলো আলো। আলোকিত হলো আকাশ, নদী, গাছপালা। সেই সাথে জীবন এবং জীবনের দূর্নিবার আকাঙ্খা। স্বাধীনতার লড়াই। বাঙালী মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে বাঁধা দেয়। যুদ্ধ করতে করতে বাদল শুনেছে, হাসান লুটতরাজ, ডাকাতি, হাইজ্যাকে নেমেছে দলবল নিয়ে। বাদল তীক্ষ্ণ চোখে বলেছে—দেখ হাসান, আমার দেশ আমার জীবনের চেয়ে প্রিয়, আমার বন্ধুত্ব সেখানে তুচ্ছ।

বাদল আজ একা এসেছে। ঘরে টিমটিমে আলো। নিনি ভয়ংকর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিত ভাবনায় ভোগে। অনুচ্চস্বরে বলে---বলুন, কি জন্য এসেছেন?

খানিকদূরে মানুষের হাঁক ডাক। বাদল কান খাড়া করে। আসার সময় দেখেছে দুজন মিলিটারী চায়নীজ ষ্টেন হাতে দোকান থেকে সিগারেট নিচ্ছে। দেয়াল টপকে একটি অন্ধকার বাড়ীতে ঢোকে। মানুষজন নেই। ভয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে অন্যত্র গেছে। আসার সময় আলতাফ বাধা দিয়েছে। 'বাদল ভাই একা গেলে বিপদ হতে পারে'। বাদল শুধু হেসেছে। 'মৃত্যুর চেয়ে বড় বিপদ আর কি। কি বলবো, হাসান এত বড় অমানুষ হয়ে যাবে, আমি ভাবতে পারিনি। সারা এলাকায় হাসান এখন ত্রাস।'

গলির সোরগোল দূরে সরে যায়। বাদল এবার কাছাকাছি আসে নিনির। বলে---হাসান কোথায়? নিনির মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই এখন। ব্যাপারটা সে অনেক আগে ভেবেছে, ভাবগতিকে তেমন করে নির্লিপ্ত বলে---হাসানের খবর আমরা জানি না।

ঃ হাসান কি করে সে খবরটা রাখ?

ঃ প্রয়োজন মনে করি না।

বাদল রেগে যায়। তাহলে প্রয়োজন আমার একলার? একজন ডাকাত, হাইজ্যাকারকে এইহাতে খুন করতে তোমারা উৎসাহিত করছো কেন?

ঃ আপনার কিছু করার থাকলে, করবেন। আমাকে শুনিয়ে লাভ কি?

বাদল দাঁত খিঁচিয়ে বলে---তুমি ভুলে যাচ্ছ। তুমি একজন সৈনিকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো। নিনি চাদরের ভেতরে উচুঁ হয়ে থাকা আগ্নেয় অস্ত্রের অংশ বিশেষ দেখে। মৃদু কাঁপুনি ওঠে শরীরে। তখন হাসানের কথা মনে পড়ে। ওকে ওরা মেরে ফেলবে। কিভাবে একটি সতেজ মন নুইয়ে পড়বে। হাসানের পরিবর্তন সত্যি আশ্চর্য। কিছুদিন হয় গভীর রাতে ঘরে ফেরে, কোনদিন ফেরেনা। মা দুশ্চিন্তা করে। ভাত নিয়ে বসে থাকে। একটি দিনের শেষে, একটি করে ঘটনার শুরু। হাসানের কথায় কেবল গণমানুষ, সর্বহারা ইত্যাদি ইত্যাদি। মা বলেছিলেন, খোকা, তোকে দেখলে আমার ভয় করে। দিনকে দিন তুই কেমন হয়ে যাচ্ছিস। এত কষ্ট করে লেখাপড়া ---।

অনেক কথার পর হাসান বলেছে---কষ্টে লেখাপড়া শিখেছি বলে নিজেকে নিয়ে সহজে খেলতে পারিনা। নিনি সোজা কথায় প্রশ্ন করেছে, ভাইয়া, তুমি এভাবে কথা বলো কেন?

: আমিতো আগের মত বলতে চাই, কিন্তু কেন যেন হয়না।

: মিথ্যে কথা। আমার মুখোমুখি যে যুবক কথা বলছে, সে হাসান নয়। তার হাসি ছিল নির্মল, প্রানবন্ত।

হাসান উদাস দৃষ্টি মেলে বলেছে---তাই, ঠিকই বলেছিস। আমি কেন যেন হাসতে ভুলে যাচ্ছি। জানিস নিনি, আজ শহরে বিরাট মিছিল হলো। জঙ্গী মিছিল। নদীর চরে বাতাসে যেমন ধূলো ওড়ে, গাঁ ভুঁই হয় অন্ধকার। শহর ছাপিয়ে ঘর ছেড়ে মানুষ আসে মিছিলে। অগ্নিরোষে ফেটে পড়ে। স্বাধীকার চায় ওরা। আজন্ম লালিত বাসনা। আমার কেবল এই লোকগুলো নিয়ে ভাবনা। ওরা সত্যি দেশকে ভালবাসে কিন্তু ওরা যাদের পেছনে যাচ্ছে, তারা মানুষের মুখোশে বাঘ। এরা একদিন কাঁদবে। ভ্যা ভ্যা করে নিজেদের দুঃখ বলবে।

নিনি বলে---তুমি কি যে প্যাচাল পার, আমি কিছুই বুঝিনা।

: সময় হলে বুঝবি। হাসান দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

বাদল যখন বললো---তোমরা কি জান, হাসান নারী ঘটিত ব্যাপারে - -। কথা শেষ হয় না। নিনি উত্তর দেয়, 'অসম্ভব'। স্রোতের মত ঘুরে দাঁড়ায়। চোখের সামনে দেয়ালে খসে পড়া পলেস্তারার ক্ষত চিহ্ন। বাতির আলোতে আরও অসহায়। ঘন দাড়ির ফাঁকে বাদলের পুরুঠোট কাঁপছে। রাগে চোখ জোড়া গাঢ় লাল। বাতির লালচে আলোতে আরও ভয়ংকর। নিনি হিংস্র মুখটিকে থামিয়ে দিয়ে, চীৎকার করে বলতে চায়, 'হাসান এতবড় অমানুষ এখনও হয়নি। সে নারী জাতিকে সম্মান করতে জানে'।

হঠাৎ দরজায় মাকে দেখে নিনি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সমস্ত স্তব্ধতা তার তেলহীন চুলে। বাদলকে দেখছে।

: কেরে নিনি?

: তোমার ছেলের বন্ধু। তোমার ছেলেকে ধরতে এসেছে। নিনির কথা থেমে থেমে মোচড়িয়ে বেরোয়। শুনে কেঁদে ফেলে মা। কান্নার

ধ্বনি মিনমিনিয়ে ওঠে প্রথম, তারপর নিস্তেজ বাড়িটা গম গম করে। বলে—বাবা, তোমরা হাসানকে আমার কোলে এনে দাও।

বাদল দরজার দিকে যায়। যেতে যেতে বলে—যে পথে পা দিয়েছে, হাসান আর ফিরবে না।

জোরে কান্নার শব্দ হলো। বাদল হাঁটছে। মাথার ওপর কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। অসহায়। বাদল রাস্তায় হাঁটছে অন্ধকারের মত নিঃশব্দে। রাতের শব্দ হয়। শব্দের মধ্যে ডুবে একান্ত হাঁটে। সবকিছু কেমন বদলে গেল। আমিতো এমন ছিলাম না। হাসান কি এমন ছিল?

বাদল পর পর দু'বার হোঁচট খেল পথ চলতে। একবার পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয়। পেছনে শহরের বুকের ওপর পুলিশ। টাওয়ার, অনেক ওপরে লাল বাতি জ্বলছে। পাওয়ার হাউজের গায়ে টিউব বাল্ব, চারপাশ আলোময়। বাদল হঠাৎ সামনে তাকিয়ে নিকশ অন্ধকার দেখে। অন্ধকার বুঝি মানবতরঙ্গের মত, গায়ে গায়ে মিশে এগুচ্ছে। উচুঁ নিচু আঁলপথ। দু'পাশে ধানের শীষ, শিশিরের ভারে নুয়ে পড়েছে। সামনে আলীপুর গাঁ। ছায়ার মত গ্রামটি। তেতুঁল আর দেবদারু গাছ গাঁয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। আলীপুর পুরনো হিন্দু জমিদারদের গাঁ। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ছিল বেশী। পাকিস্তান হবার পর অধিকাংশ হিন্দুরা মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেছে। কেউ বলে—ওরা দেশকে ভালবাসতে পারেনি। কেউ বলে—ক্ষমতা যখন ছিল অত্যাচার আর অনাচার এমনভাবে করেছে এখন নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। এখনকার বাসিন্দারা পুরনো নাম 'গোবিন্দপুর' বদলিয়ে আলীপুর রেখেছে। সেও অনেক আগের কথা। বাদল বাবার মুখে এ কাহিনী শুনেছে।

বাদল ক্যাম্পে আসে রাত এগারটা নাগাদ। ক্যাম্প বলা যাবে কিনা, একরাতের আশ্রয়। একজন কৃষকের বাড়ীতে। দলবল নিয়ে ওরা আশ্রয় চাইলে লোকটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘর ছেড়ে দেয়। উনুন জ্বালিয়ে খানা তৈরী করে বাড়ীর মেয়েরা। ভাত আর ডাল। বাদল না খেয়ে বেরিয়েছিল। আসার সংগে সংগে আলতাফ বললো—কমাণ্ডার আপনাকে ডেকেছিল। দু'বার লোক পাঠিয়েছে আপনার খোঁজে।

ঃকেন ডেকেছে?

ঃ যুদ্ধের প্রোগ্রাম করবে হয়তো।

বাদল ষ্টেনগান হাতে নেয়। অস্ত্রের দিকে তাকিয়ে হাসানের মনে পড়ে। যুদ্ধে যাবার আগে হাসান বাধা দিয়েছে। আদর্শ আর কর্মসূচী ছাড়া কিছু হয়না। তুই বলতে পারিস, এ যুদ্ধের জন্য তোরা কোন কর্মসূচী পেয়েছিস? কিভাবে যুদ্ধ হবে। প্রধান শত্রু কে? দেশ স্বাধীন হলে ক্ষমতায় বসবে কারা? বাদল ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছে---এখন তত্বকথার সময় নেই। ওরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। ওদের বাঁধা দিতে হবে। আমাদের কর্মসূচী না থাক, দেশপ্রেম আছে। হাসান শুনে শব্দ করে হেসেছে। যুদ্ধে কেবল ক্ষমতার হস্তান্তর হবে। বাদল চলে আসার পর সেইযে ছাড়াছাড়ি। দুই বন্ধু দুধের বাটিতে হাত ডুবিয়ে খেয়েছে কতদিন। কাড়াকাড়ি শুরু করলে হাসানের মা প্রায়ই বলতেন, আমার ছেলে দুটো ভারী দুষ্ট। হাসান দুধের বাটিতে হাত ডুবালে সংগে সংগে বাদলও হাত ডুবিয়ে দিত। কে বেশী খাবে তারই প্রতিযোগিতা। নিনির অভিযোগ ভাল ভাল জিনিসগুলো তোমার দুই ছেলেকে খাওয়াও, আমি বুঝি কেউ না?

লম্বা বিছানায় ওরা শুয়ে। একজন শুয়ে শুয়ে ঘড়ি দেখলো, বারটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। মানুষজনের কোন সাড়া নেই। বাদল সবাইকে বলে---তোমরা রেডি থেক, আমি কমাণ্ডারের সংগে দেখা করে আসি।

ওরা তৈরী হতে থাকে। কোমরে বেল্ট বাঁধে। কারও কারও কাছে বাড়তি কিছু কাপড়। পোটলায় বাঁধে। যে কোন মুহূর্তে অর্ডার আসবে, 'এ্যাডভান্স'। তারপর পজিশন। ক্রোলিং। যুদ্ধ। এখন যার সংগে বসে কথা বলছে, কাল হয়তো তাকে পাবেনা। পরশু ময়মনসিং ব্রীজ অপারেশনে শত্রুর ব্রাশ ফায়ারে এক সংগে তিনজন ঢলে পড়লো। কেন রকমে লাশ আনতে পেরেছিল একজনের।

আলতাফ সিগারেট ধরায়। রাইফেলের ম্যাগাজিন ঠিক করতে করতে জহুরুল বলে---আলতাফ, সিগারেট হবে নাকি?

আলতাফ বিনীতভাবে বলে--আর নেই। এটাই ভাগ করে খাই। আলতাফ ঘন ঘন কয়েকটা দম দিয়ে নেশা খাটো করে। নেশায় ক্ষত জহুরুল। সিগারেট পেয়ে গাঁজার কল্কির মত দম দেয়। শোঁ শোঁ শব্দ

হয়। ঘরে উত্তর কোণে জয়নাল চুপচাপ বসে। অসুখ। দুদিন হলো জ্বর। তবু ছুটতে হয়। যুদ্ধে যেতে হয়।

হঠাৎ ঠা ঠা শব্দে এল, এম, জি গর্জে উঠলো। গাঁয়ের উত্তর দিক থেকে। ঘরের সবগুলো মুখ চিমটে ধরে গেল। রক্ত চলাচল থেমে গেল শরীরে। আচমকা ব্রাশ ফায়ার, ব্যাপারটা বুঝতে পারেনা কেউ। বোধের শিরাগুলো অচল হয়ে পড়ে। কারা ফায়ার দিচ্ছে? কেন?

হাতের সামনে অস্ত্রগুলো খামচে তুলে নেয় সবাই। জয়নালের জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে এগোয়। ক্রোলিং নয়;কোমরা ভাঙ্গা মানুষের মত পাছা লেপটিয়ে। দূরে কমাণ্ডারের হুংকার শোনা যায়। তোমরা পশ্চিম দিকে পজিশন নাও। ওরা যেন গায়ের ভেতর ঢুকতে না পারে।

হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে ওরা। গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে। গণ্ডারের চামড়ার মত পুরু অন্ধকার। কিছুই ঠাওর করতে পারে না। ঢালু বেয়ে নামছে দ্রুত। সামনে বাঁশ ঝাড়, সেখানে পজিশন নেয় সবাই।

বৃষ্টির মত গুলি। গুলি থামলেও শব্দ তরঙ্গ চলে। বাদল পাড় ঘেঁষে ক্রোলিং করছে। কাদামাটিতে জড়িয়ে গেছে সমস্ত শরীর। ভরা নদীর মাঝখানে পিপড়ের মত ঘুরছে ও। গুলির শব্দে বাতাস ঢেকে গেছে। শব্দের মধ্যে একজন বাদল। বারে বারে বুঝতে চায়--এরপরেও জীবন আছে। আর সেই জীবনের জন্য এই যুদ্ধ। বাতাস আছে বেশ। অন্ধকারে বাতাস গায়ে ধরে না। চারপাশে গুলির শব্দ। দাপিয়ে দাপিয়ে মেশিনগান গোঙড়ায়। বিকট শব্দ। গাঁ কাঁপছে। দ্বীপারন্যে শত্রুর মুখে বাদল একলা, এমন ভাবনা ওর। নিজের ষ্টেনগান একবারও শব্দ করেনি। চুঁই চুঁই করে মর্টারের সেল উড়ে যায়। দূরে গিয়ে শব্দ হয়, 'ড্রাম'।

বাদল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সামনে কয়েকটি ফাঁকা বাড়ী। মাথা নিচু করে দৌড়ে সেইদিকে যায়। এ্যাডভান্স পার্টি ওখানে থাকতে পারে। রাস্তার পাশে খাল। বেশ গর্ত। অন্ধকার সেখানে আরও জমাট। বিশকাটালি গাছে গর্ত ঢাকা। অন্ধকারে সাঁতার কাটছে, এমন ধারণা করে এগোয়। হঠাৎ কতগুলো মুখ ওকে ঘিরে নেয়। বাদল চমকে ওঠে। ওদের অস্ত্রগুলো অন্ধকারেও চক চক করে।

একটা ভারী জুতোর লাথি পড়লো কোমরে। বিদেশী ভাষায় গাল ঝারলো একজন, শালা, বানচোত কা বাচচা। লাথি খেয়ে নিচে পড়লো

বাদল। গর্তের মধ্যে। বিশ কাটালি গাছ মোচড়িয়ে দাপাদাপি করে বাদল কিছু ধরতে চেষ্টা করে। ভেজা মাটি ধসে যাচ্ছে ক্রমশঃ। কনুইয়ে ভর করে মাথা তোলে। তখনই ব্রাশ ফায়ার হলো। বিশকাটালিগাছ ছিঁড়ে ওপরে ওঠে। বাদল গা এলিয়ে পড়ে। শব্দ করতে পারেনা।

দূরে যুদ্ধ চলছে। দুপক্ষের শ্লোগান হয়। হুংকার দিচ্ছে ঘন ঘন। ভয় নেই, ওরা পালাচ্ছে। উত্তর পাশে নতুন বাহিনী এসেছে একটি। ওদের সাহায্যে দুদল প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ চালায়। আলতাফ ম্যাগাজিন বদলিয়ে জয়নালকে বলে—জয়নাল তোর শরীর কেমন?

ঃ আমি ঠিক আছি। জ্বর উঠে গেছে। বলতে বলতে এস, এল, আর, ঠিক করে। দৌড়ে আলের কাছে যায়। সামনে টুকর বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা। বোঝা যায় কারা যেন পালাচ্ছে। নিশানা ঠিক করে গুলি নড়তে থাকে।

আলতাফ হাঁপাচ্ছে। বলে—বাদলভাই কোনদিকে পজিশন নিয়েছে?

জয়নাল বলে—বলতে পারছি না। উত্তরদিকে নতুন বাহিনী এসেছে একটি, হয়তো ওদের সাথে আছে।

গুলি থেমে যায় অনেক পরে। কোথাও শব্দ নেই। প্রচণ্ড গোঙানীর পর একটি বাঘ, ক্লান্ত। সমস্ত গ্রাম নিথর নিস্তব্ধ। বাদল গোঙড়াচ্ছে। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে বিশকাটালি গাছ ধরতে চেষ্টা করে। দু'পায়ের নিচে অসম্ভব যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় পা অবশ হয়ে যাচ্ছে।

খালের গর্ত একদম খাড়া। কাদার মধ্যে দুপা আটকে গেছে।

রক্তে মাটি কাদা কাদা হয়েছে দ্বিগুণ। মৃত্যুর চিন্তা ওকে গ্রাস করে।

মানুষজনের কথা শোনা যায়। শ্লোগান দিচ্ছে। জয়ের উল্লাস ধ্বনি। উত্তেজনায় বাদল মাটি খামচে ধরে। উঠে দাঁড়াতে চায়। কথা বলতে চায়। উল্লাস করতে চায়। শুধু গোঙানীর শব্দ হয় মুখে। গোঙাতে গোঙাতে নিজের ষ্টেনগানটা খোঁজে। তখনই একজোড়া হাত দেখে সামনে। ইশারা করছে ধরতে। আবছা অন্ধকারে কিছু বুঝতে পারে না। বাঁচার আকুলতায় খপ করে ধরে নিজের শরীরের ভার ছেড়ে দেয় তার ওপর। মুহূর্তে সমস্ত যন্ত্রণা ম্লাণ করে দিয়ে নতুন ভাবনা ওকে আক্রান্ত করে। বারুদের গন্ধ নেই। সমস্ত গন্ধ উপচিয়ে একটি চেনা গন্ধ, ইন্দ্রিয়কে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কে যেন কথা বলে। হাত ধরেই চমকে ওঠে। এই হাত, পাল্লা করে দুধের বাটিতে ডুবিয়েছে, মনে পড়ে।

ফুল খেলবার দিন নয় / ডাকসু'র একুশের প্রকাশনা ১৯৮২

মূল্য : দুই টাকা